Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম প্রচারে নবি ও সাহাবীদের দাওয়াতি মিশন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আয়েশা আক্তার

রোলঃ ২১৫০০১৫০৭

৮ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম প্রচারে নবি ও সাহাবীদের দাওয়াতি মিশন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আয়েশা আক্তার

রোলঃ ২১৫০০১৫০৭

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলাম প্রচারে নবি ও সাহাবীদের দাওয়াতি মিশন" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আয়েশা আক্তার, আইডিঃ ২১৫০০১৫০৭ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মামুনুর রশীদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলাম প্রচারে নবি ও সাহাবীদের দাওয়াতি মিশন " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মামুনুর রশীদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Ayesha Akter

তারিখঃ

৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

(স্বাক্ষর)

আয়েশা আক্তার

আইডিঃ ২১৫০০১৫০৭

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
লেখকের কলাম	৭
সারসংক্ষেপ	৯
ভূমিকা	১১
দাওয়াত শব্দের অর্থ	১২
নবী ও রাসূল	১২
সকল জাতির জন্য নবী ছিল	১২
সাহাবী	১৩
সাহাবীদের গুনাবলি	১৬
মিশন	১৭
মিশন দ্বীন ইসলাম	১৭
ইসলাম সকল মানুষের ধর্ম	১৮
আল্লাহ সকল মানুষের স্রষ্টা ও মালিক	১৮
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম সবার নবী	১৯
কুরআন সকলের জন্য	১৯
নবীগণের দাওয়াতের স্বরুপ ও বিষয়বস্তু	২০
এক: আকীদা, বিশ্বাস (১) তাওহীদ (২) রিসালাত (৩) আখিরাত	২১-২২
দুই: ইবাদত	২৩
তিন: মুআমালা বা লেনদেন	২৪
চার: মুআশারা তথা সামাজিক কর্তব্য ও অধিকার	২৬
পাঁচ: সিয়াসত তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থা	২৭
ছয় উত্তম আখলাক	২৮
দাওয়াত দেয়ার ইসলামি বিধান	৩০
ফরজে আইন	৩০
সুন্নত	৩১
ফরজে কেফায়া	৩১
জিম্মাদারী আদায়ের পদ্ধতি	৩২

পিপীলিকা	৩২
হুদহুদ পাখি	৩২
আসহাবে কাহাফের কুকুর	৩৩
দা’ঈর গুনাবলি	৩৪
এখলাস	৩৪
উত্তম আমল	৩৪
আত্মশুদ্ধি	৩৫
নামায	৩৫
কিয়ামুল লাইল	৩৬
রোযা	৩৬
দা’ঈ কৃপন হবে না	৩৬
কুরআন তেলাওয়াতের গুরুত্ব	৩৭
ইলম ও জ্ঞান	৩৭
আমলের পূর্বে ইলম অর্জন	৩৮
তাক্বওয়া	৩৯
নম্রতা	৩৯
ক্ষমা	৩৯
এতেদাল	৪০
ধৈর্য্য বা সবর	৪০
উত্তম চরিত্র	৪১
ক্রোধ	৪১
ইসলাম প্রচারে নবীদের দাওয়াত ও সংগ্রাম	৪২
স্বীয় কওমের প্রতি হযরত নূহ (আঃ) এর দাওয়াত ও ইসলাম প্রচার	৪৪
স্বীয় কওমের প্রতি হযরত হূদ (আ.) এর দাওয়াত	৪৯
স্বীয় কওমের প্রতি হযরত সালেহ (আ) এর দাওয়াত	৫১
স্বীয় কওমের প্রতি হযরত ইব্রাহিম (আ) এর দাওয়াত	৫২
স্বীয় কওমের প্রতি হযরত লূত (আ.) এর দাওয়াত	৫৪

স্বীয় কওমের প্রতি হযরত শোয়াইব (আ) এর দাওয়াত	৫৬
হযরত মূসা (আঃ) এর দাওয়াত	৫৭
হযরত ইসা (আঃ)-এর দাওয়াত	৫৯
বিশ্বনবীর দাওয়াত ও ইসলাম প্রচার	৬১
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম এর গোপন দাওয়াত	৬১
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম এর প্রকাশ্য দাওয়াত	৬২
ইসলাম প্রচারে সাহাবীগণ	৬৪
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম এর সবচেয়ে প্রিয় সুন্নত	৬৬
দাওয়াতি কাজে নবী ও সাহাবীদের কিছু পন্থা 65	৬৭
শেষ কথা	৬৯

লেখকের কলাম

হে নবী! আমার বান্দারা যদি তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে তাদের বলে দাও যে, আমি তাদের অতি নিকটে, আমাকে যে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকি, কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে ঈমান আনা তাদের একান্ত কর্তব্য। আশা করা যায় তারা প্রকৃত সত্য পথের সন্ধান পাবে ।

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

ইহা সেই কিতাব; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই,
মুত্তাকীদের জন্য ইহা পথ-নির্দেশ,

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ
دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ
وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। প্রার্থনাকারী যখন আমার নিকট প্রার্থনা করে আমি তাহার প্রার্থনায় সাড়া দেই। সুতরাং তাহারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাহাতে তাহারা ঠিক পথে চলিতে পারে।

[সূরা বাকারা ২ : ১৮৬]

আলহামদুলিল্লাহ। সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি এত বড় একটি কাজ আঞ্জাম করার সুযোগ করে দিয়েছেন অসংখ্য-অগণিত শুকরিয়া আদায় করছি সেই মহামহিম রব্বে কারীমের, যিনি " ইসলাম প্রচারে নবী ও সাহাবীদের দাওয়াতি মিশন" এসাইনমেন্ট এর কাজটি সম্পন্ন করার তৌফিক দিয়েছেন।

সকলের নিকট দো'আ প্রার্থী। দো'আ করবেন আল্লাহ তা'আলা যেন এসাইনমেন্টটিকে কবুল করে নেন, সাথে সাথে আমি অধমকেও। এছাড়া, এসাইনমেন্টটি যেন আমার নাজাতের উসিলা হয়ে যায় এবং পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে বাকি কাজগুলো করতে পারি সেজন্যেও দো'আ করবেন।

পরিশেষে বলতে চাই, কোনো মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই এসাইনমেন্টের কোন অংশে অসংগতিপূর্ণ কোন কিছু পরিলক্ষিত হলে সাথে সাথে আমাকে অবগত করার চেষ্টা করবেন। ইন শা আল্লাহ, পরবর্তীতে তা ঠিক করা হবে।

আয়েশা আক্তার

ইমেইল: a.ayesha. popy9@gmail.com

সার সংক্ষেপ

"হে রাসূল! সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম, আপনি বলে দিন * এটাই আমার পথ, আমি পরিপূর্ণ বুঝে শুনে আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকি এবং যারা আমার অনুসরণ করে তারাও। আল্লাহ শিরক থেকে পবিত্র। যারা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই"।

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۗ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۗ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

(সূরা: ইউসুফ, ১০৮)

মদীনার পড়ন্ত বিকেল। জিহাদের সফর থেকে ফিরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম আগে মসজিদে যেতেন। দু'রাকআত নামাজ পড়ে সবার আগে যেতেন কলিজার টুকরা ফাতিমা (রা.) ঘরে। এরপর স্ত্রীদের ঘরে ঘরে যেতেন। একবার জিহাদ থেকে ফিরে চোখের মণির সাথে দেখা করতে এলেন নবিজি। হাত-পা ধুলোমাখা, পোশাকে-মুখে ময়লা-মাটি। কপাল বেয়ে ঝরছে ঘাম। বহুদিন পরে পিতাকে দেখে ফাতিমা (রা.) কাঁদতে কাঁদতে বাবার কপালে চোখে চুমু দিতে লাগলেন।

- কাঁদছিস কেন রে, মা?

- আব্বা, আপনার অবস্থা দেখে কাঁদছি। রোদে পুরে কালো হয়ে গেছেন। কাপড়-চোপড় মলিন বিবর্ণ -হয়ে গেছে।

-মারে, কাঁদিস না। আল্লাহ তা'আলার তোর বাবাকে এমন দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাকে তিনি একদিন জমিনের বুকে সমস্ত কাঁচা-পাকা ঘর আর পশমের তাঁবুর মাঝে প্রবেশ করিয়ে তবেই ছাড়বেন। কেউ এই দ্বীন গ্রহণ করে সম্মানিত হবে। কেউ গ্রহণ না করে বেইজ্জত হবে। এখন এমনকি যেখানে যেখানে রাত পৌঁছে, সেখানে এই দ্বীন গিয়ে পৌঁছবে। [১] নবিজির স্বপ্ন তাঁর দ্বীন প্রতিটি ঘরে পৌঁছুবে। এই স্বপ্ন নবিজিকে ঘুমোতে দিত না। রাতের পর রাত দিনের পর দিন। তাঁর স্বপ্ন শুধুমাত্র আল্লাহর মনোনীত দ্বীনের দাওয়াত যাতে ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর কাঁচা- পাকা প্রতিটি

ঘরের কোন পর্যন্ত। প্রতিটি মানুষ যাতে লাভ করতে সক্ষম হন সৃষ্টিকর্তা মহান প্রতিপালকের আসল পরিচয়। তাঁর পানে আত্মসমর্পন করে স্বার্থক করে তুলতে পারেন মানব জীবন। বাস্তবায়ন করতে পারেন সৃষ্টির উদ্দেশ্য। সম্পর্ক গড়ে নিতে পারেন আসল মালিকের সাথে।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ
بِاللّٰهِ ۗ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ

[সূরা ইমরান ১১০]

তেইশ বছরের জীবনে তিনি আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক প্রায় এক লক্ষ মডেল মানুষ, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম তৈরি করে গেলেন। বিশ্বের দিক-দিগন্তে ইসলামের অমিয় বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়ার পিছনে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য।

নবী-রাসূলগণ এবং সাহাবীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ ইতিহাসের পাতায় চিরভাস্বর হয়ে আছে। তাঁরা যমীনের বুকে আল্লাহর দাসত্ব- প্রতিষ্ঠায় পৃথিবীর পথে-প্রান্তরে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এ পথে নির্যাতনের কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় নিজেকে সঁপে দিতেও তাঁরা বিন্দুমাত্র পরওয়া করেনি। এমনকি নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় তাঁরা নিজেদের জান-মাল, সময়-শ্রম সবকিছুই উৎসর্গ করেছেন। আল্লাহর পথে তাঁদের সেই ত্যাগপূত অবদানের মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে ইসলামের সুমহান আর্দশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

তথ্যসূত্র :

[১] আবু সালাম খুশনী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত [হায়াতুস সাহাবা ১/৭৫], মিকদাস আল-আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত [মুসনাদে আহমাদ ২৩৮১৪, আরনাউত সহীহ] তামিম দারী রা. বর্ণিত [মুসনাদে আহমাদ ১৬৯৫৭ সহীহ আলবানী']

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ
بِاللّٰهِ ۗ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ

ভূমিকা

দাওয়াত দ্বীন ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। মানব জীবনে ইসলামের অস্তিত্ব নির্ভর করে দাওয়াতি কাজের ওপর। আল্লাহ তা'য়ালা যুগে যুগে যত নবী-রাসুল প্রেরণ করেছেন তাঁদের সকলেরই দায়িত্ব ছিল মানুষের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ সাধন ও সফলতার বন্ধ তালা একমাত্র দাওয়াতে দ্বীন খুলে দিতে পারে। মানবতার বিবেক, মানব উন্নয়ন ও বিকাশের দরজার তালা কাজই কেবল খুলে দিতে পারে। দাওয়াতি কাজ মানে ইসলাম প্রচার-প্রসারের কাজ। দাওয়াতের মাধ্যমেই ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে। মুসলিম জাতির বিস্তৃতি লাভ করে।

বর্তমান সময়ে ইসলামের দাওয়াত অন্যের নিকট পৌঁছাবার গুরুত্ব মোটেও গৌণ করে দেখার কোন সুযোগ নেই। ইসলামের প্রথম প্রকাশ ঘটে দাওয়াতের মাধ্যমে। দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামের অগ্রগতি ও বিকাশ সাধিত হয়। নির্মিত হয় ইসলামী সমাজ ও সভ্যতা। সৃষ্টির আদিকাল থেকে আমাদের আদী পিতা হযরত আদম আলাইহিসাল্লাম এর মাধ্যমে ইসলামের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর- মাধ্যমে যে ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়েছিল এর রশ্মি গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার পেছনে রয়েছে আল্লাহর পথে নিবেদিত প্রাণ, তাঁর প্রিয় নবী রাসূলগণ ও সাহাবীদের অক্লান্ত ত্যাগ, কুরবানী, পরিশ্রম ও ব্যাপক দাওয়াতি কাজ। উম্মাহর উত্থানে দ্বীনি দাওয়াতি কাজের ভূমিকা খুবেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বর্তমানে উম্মাহর পতনের কারণও হলো দাওয়াতি কাজের দুর্বলতা। সমাজের জাহেলিয়াত, কুসংস্কার ও সকল অশ্লীলতার বন্ধের প্রধান পন্থা হতে পারে দাওয়াতি কাজ। একমাত্র ইলাহই মানবতার সকল সমস্যার ও অশান্তির শেকড় কেড়ে নিতে পারে। খুলে দিতে পারে শান্তির পায়রা।

দাওয়াত শব্দের অর্থঃ দাওয়াত শব্দটি আরবি دعوة "দাওয়াতুন"। যার অর্থ আহ্বান, ডাকা, নিমন্ত্রণ। ইংরেজিতে বলে Missionary Activity, Missionary Work, propaganda.

অর্থাৎ- কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এর দিকে আহ্বান করাকে বলা হয় দাওয়াত।

ইসলামী পরিভাষায় দাওয়াত অর্থ আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকা, ঈমানের পথে ডাকা, সত্য- সুন্দরের প্রকাশ, ইসলামের মহান বাণী প্রচার। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের পথে মানবতাকে আহ্বান করা, জান্নাতের রাস্তা দেখানো। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন,"

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

ঐ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম কথা আর কার হাতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করে"। (সূরা হা-মিম-সিজদাহ, ৩৩)

নবী ও রাসূল: নবি, বহুবচন أَنْبِيَاء (আনবিয়া) অর্থ প্রতিনিধি, সর্তককারী। রাসূল, বহুবচন رُسُل (রুসুল) অর্থ বার্তাবাহক বা মুরসাল مُرْسَل বহুবচন مُرْسَلُون (মুরসালুন) অর্থ বার্তাবাহ আল্লাহ প্রত্যেক জাতির নিকট নবীদেরকে প্রেরণ করেছেন। মানবজাতির নিকট আল্লাহর বার্তা পৌছানোর জন্য আল্লাহ নবী ও রাসূলদের প্রেরণ করেছেন। যেসব নবীদের উপর আল্লাহ তা'আলা কিতাব বা ওহী নাযিল করেন তাঁদের রাসূল বলা হয়। প্রত্যেক নবীগণ নির্দিষ্ট এক বা একাধিক গোত্র বা জাতির জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম ই, সমগ্র মানবজাতির নিকট আল্লাহর বার্তা পৌঁছানোর প্রেরিত হয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন"

বলে দাও, হে মানব মন্ডলী। তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। [সূরা আরাফ: আয়াতঃ ১৫৮]

সকল জাতির জন্য নবী ছিলঃ সকল উম্মতের মাঝেই কোনো না কোনো রাসূল বা তাঁর প্রতিনিধি প্রেরিত হয়েছেন। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন

"নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক উম্মতের ভেতর কোনও না কোনও রাসূল পাঠিয়েছি এই পথনির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগূতকে পরিহার কর। তারপর তাদের মধ্যে কতক তো এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেছেন আর কতক ছিল এমন, যাদের উপর বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে দেখ, (নবীদেরকে) অস্বীকারকারীদের পরিণতি কী হয়েছে?   [সূরা: আন-নাহল আয়াত:৩৬]

সকল রাসূলের প্রতি আল্লাহ তাআলা হেদায়েতের বাণীরূপে কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাদের সমর্থনে মু'জেযা বা অলৌকিক নিদর্শন ও দান করেছেন। যেন তাঁদের মাধ্যমে অফুরন্ত কল্যাণ ও হেদায়েতের বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে যায় এবং যেন আলো- অন্ধকারের স্পষ্ট পার্থক্য রেখা তারা বুঝতে সক্ষম হয়। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

(হে রাসূল!) আমি তোমার আগে ও বহু রাসূল পাঠিয়েছি তাদের আপন- আপন সম্প্রদায়ের কাছে। তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল - প্রমাণ নিয়ে এসেছিল। [সূরা: আর-রুম আয়াত: ৪৭]

সাহাবী: 'সাহাবী' শব্দটি আরবী ভাষার 'সুহবত' শব্দের একটি রূপ। একবচনে 'সাহেব' ও 'সাহাবী' এবং বহুবচনে সাহাবা" ব্যবহৃত হয়। আভিধানিক অর্থ সংগী, সাথী, সহচর, একসাথে জীবন যাপনকারী অথবা সাহচর্যে অবস্থানকারী। ইসলামী পরিভাষায় 'সাহাবা' শব্দটি দ্বারা রাসুলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম মহান সংগী-সাথীদের বুঝায়। আল্লামা ইবন হাজার (রাহ.) আল- ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা' গ্রন্থে সাহাবীর সংজ্ঞা দেন এভাবে যে "সাহাবী সেই ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম প্রতি ঈমান সহকারে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ইসলামের ওপরই মৃত্যুবরণ করেছেন।"

সাহাবীদের পরস্পরের মধ্যে মর্যাদা হিসেবে স্তরভেদ থাকতে পারে, কিন্তু পরবর্তী যুগের কোন মুসলমানই, তা তিনি যত বড় জ্ঞানী, গুণী ও সাধক হোন না কেন

কেউই একজন সাধারণ সাহাবীর মর্যাদা ও লাভ করতে পারেন না। এ ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ্ এবং ইজমা একমত। এই সাহাবীরাই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম ও তাঁর উম্মাতের মধ্যে প্রথম মধ্যসূত্র। পরবর্তী উম্মাত আল্লাহর কালাম পবিত্র কুরআন, কুরআনের ব্যাখ্যা, আল্লাহর রাসূলের পরিচয়, তাঁর শিক্ষা, আদর্শ, মোটকথা দ্বীনের সবকিছুই একমাত্র তাঁদেরই সূত্রে, তাঁদেরই মাধ্যমে জানতে পেয়েছে। পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াত ও অসংখ্য হাদীসে সাহাবীদের মর্যাদা ও ফজীলত বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি আয়াতের অর্থ উদ্ধৃত হলোঃ

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, তাঁর সহচরগণ, কাফিরদের প্রতি যে কঠোর এবং নিজেদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখবে। তাদের মুখমন্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকবে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরুপই এবং ইনজীলেও।" [সূরা: আল ফাতহ, আয়াত: ২৯]

"মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যারা নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এটা মহা কামিয়াবী।" [সূরা: আত-তাওবা, আয়াত ১০০]

এ সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। তারাই তো সত্যাশ্রয়ী। মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে (মদীনা) বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে তারা মুহাজিরদের ভালোবাসে এবং মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্খা পোষণ করে না, আর তারা তাদেরকে নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও।" (সূরা আল হাশর, আয়াত: ৮-৯)

এমনিভাবে সূরা আল-ফাতহ-১৮, সূরা আল-ওয়াকিয়া-১০, এবং সূরা আল আনফালের-৬৪ নাম্বর আয়াতসহ বিভিন্ন আয়াতে কোথাও প্রত্যক্ষ আবার কোথাও পরোক্ষভাবে সাহাবায়ে কিরামের প্রশংসা এসেছে।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম নিজেও তাঁর সাহাবীদের শানে বক্তব্য রেখেছেন। তাঁদের সম্মান, মর্যাদা ও স্থান নির্ধারণ করে অনেক প্রশংসা করেছেন। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"আমার উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম লোক হচ্ছে আমার যুগের লোকেরা। তারপর তার পরের যুগের লোকেরা, তারপর তার পরের যুগের লোকেরা। তারপর এমন একদল লোকের আবির্ভাব হবে যাদের কসম হবে তাদের সাক্ষ্যের অগ্রগামী। তাদের কাছে সাক্ষী চাওয়ার আগেই তারা সাক্ষ্য দেবে। "তোমরা আমার সাহাবীদের গালি দেবে না, কসম সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার জীবন, তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও ব্যয় করো তবুও তাদের যে কোন একজনের 'মুদ' বা তার অর্ধেক পরিমাপ যবের সমতুল্য হবে না"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম থেকে ইবন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন:

তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাবের যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তার ওপর আমল করতে হবে। তা তরক করা সম্পর্কে তোমাদের কারো কোন ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি আল্লাহ কিতাবে কোন সিদ্ধান্ত না পাওয়া যায় তাহলে আমার সুন্নাতে খোজ করতে থাক। যদি তাতেও না পাওয়া যায় তাহলে আমার সাহাবীদের কথায় তালাশ করতে হবে। আমার সাহাবীরা আকাশের তারকা সদৃশ। তার কোন একটি তোমরা গ্রহণ করলে সঠিক পথ পাবে। আর আমার সাহাবীদের পারস্পারিক ইখতিলাফ বা মতপার্থক্য তোমাদের জন্য রহমত স্বরূপ"।

মিশকাত শরীফে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম বলেছেন

"আমার উম্মাতের মধ্যে একটি ফিরকাই নিশ্চিত জান্নাতী হবে। জিজ্ঞেস করা হলো হলো, তারা কে? বললেন: যারা আমার ও আমার সাহাবীদের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

সাহাবীদের গুণাবলিঃ

সাহাবীদের সমাজ ছিল একটি আদর্শ মানব সমাজ তাঁদের কর্মকান্ড মানব জাতির জন্য একটি উৎকৃষ্টতম নমুনা স্বরূপ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁদের সততা, বিশ্বস্ততা, ভদ্রতা, আত্মত্যাগ ও সদাচরণ তুলনাবিহীন। তাঁরা ছিলেন একে অপরের প্রতি সবসময় শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিশীল। গরীব ও মুহতাজ শ্রেণির প্রয়োজন ও চাহিদাকে তাঁরা সবসময় অগ্রাধিকার দিতেন। বীরত্ব ও সাহসিকতায় তাঁরা ছিলেন নজীরবিহীন । রাসূলুল্লাহর (সা) ইত্তেবা বা অনুসরণ ছিল তাঁদের জীবনের মূল লক্ষ্য। তাঁদের জীবন-মরণ উভয়ই ছিল ইসলামের জন্য।

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম যে সর্বোত্তম সমাজের ভিত্তি রেখেছিলেন, সাহাবায়ে কিরাম হচ্ছেন সেই সমাজের প্রথম নমুনা। রাসূলে পাকের (সা) সুহবতের বরকতে তাঁরা মহান মানবতার বাস্তব রুপ ধারণ করেছিলেন। 'আদল, তাকওয়া, দিয়ানাত, ইহসান এবং খাওফে খোদার তাঁরা ছিলেন সমুজ্জ্বল প্রতীক। তাঁদের মধ্যে এই অনুভূতি সদা জাগ্রত ছিল যে, এই পৃথিবীতে তাঁদের আগমন ইসলামের ঝান্ডা সমুন্নত করা ও মানব জাতির মধ্যে সমতা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য। এখানে তাঁদেরকে খিলাফতে ইলাহিয়ার আমীন বা বিশ্বাসী রুপে আল্লাহর উদ্দেশ্য পূরণ করতে হবে। পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা তাঁদের মধ্যে এমন পরিচ্ছন্ন হৃদয় ও ন্যায়ের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছিল যে, হক ও ইনসাফের ব্যাপারে তাঁরা যেমন নিজেদেরকে দায়িত্বশীল মনে করতেন, তেমন মনে করতেন অন্যদের কেও। তাঁরা উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও নিজেদের সন্তান ও আত্মীয়-বন্ধুদের শরয়ী বিধানের শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারেনি।

মোট কথা ঈমান ও বিশ্বাস তাদের সামগ্রিক যোগ্যতাকে আলোকিত করে দিয়েছিল। তাঁরা খুব অল্প সময়ে বিশ্বের সর্বাধিক অংশ প্রভাবিতা করেছিলেন। তাঁদের ইসলাম প্রচারের কাজ, সামরিক যোগ্যতার নজীর ইতিহাসের পাতায় বিদ্যমান।

মিশনঃ মিশন (mission) কোনো লক্ষ্য পূরণের জন্য যে লড়াই বা সংগ্রাম করতে হয় অথবা আপনি নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরন করার জন্য যে যে পরিকল্পনা বা কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন সেইগুলোর বাস্তবায়ন করাই হল মিশন (mission)।

মিশন দ্বীন ইসলাম: নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট (গ্রহণযোগ্য) দ্বীন কেবল ইসলামই। মিশন হলো কোন লক্ষ্যকে সামনে রেখে ঐ লক্ষ্যের দিকে আহবান করা, পরিকল্পনা করা এবং বাস্তবায়নে এগিয়ে চলা।

আর মিশন দ্বীন হলো ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন পরিত্রাণের আশায় আল্লাহর পথে আহবান করা, জীবনের উদ্দেশ্য বলে দেওয়া এবং সঠিক পথ সুস্পষ্ট করা। ইসলাম একটা দ্বীন, পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থাপনা (সিস্টেম অফ ম্যানেজমেন্ট)। ব্যক্তি-ব্যবস্থাপনা, পরিবার ব্যবস্থাপনা, সমাজ-বাজার অর্থনীতি ব্যবস্থাপনা, রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা, আইন-বিচার ব্যবস্থাপনা, জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, যুদধ- আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা। অর্থাৎ ইসলাম একটা World view দাবি করে। মানবতার সব চেয়ে বড় সেবা হলো ইসলামের চশমার খোঁজ দেওয়া। অর্থাৎ ইসলামের পথ দেখিয়ে দেওয়া। ইসলামের ওয়াল্ডভিউ দেখিয়ে দেওয়া, যে কত সুন্দর জীবন ব্যবস্থাপনা রয়েছে ইসলামে। ইসলাম একটি সভ্যতা হিসেবে, একটি বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে দেখা। যে সভ্যতার শুরু হেরার আলোয়। প্রত্যেক মুমিন মুসলিমের জীবনের মিশন হওয়া উচিত এই সভ্যতার জন্য কাজ করা। সকল মানুষকে আল্লাহর, দাসত্ব গ্রহনের আহবান পূর্বক বাস্তব জীবন থেকে ফাসেকী (পাপাচার) ও মুনাফেকী (কর্ম বৈষম্য) দূর করে সৎ ও খোদাভীতি সম্পন্ন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজ থেকে সকল প্রকার জাহেলী মতাদর্শ বা ব্যবস্থা নির্মূল করে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করা। আর দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার জন্য সবথেকে বড় শর্ত হলো আল্লাহর রহমত ও সন্তোষ অর্জন। পবিত্র কুরআনের বাণী,

"যে ব্যক্তি দান করার, ভালো কাজ করার ও মানুষের মাঝে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার আদেশ দেয়, সে ব্যক্তির আদেশে কল্যাণ রয়েছে। যে ব্যক্তি এসব কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য করবে, আমি অবশ্যই তাকে মহাপুরষ্কার দান করবো।" [সূরা: আন নিসা, আয়াত: ১১৪]

ইসলাম সকল মানুষের ধর্মঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম। ইসলাম মানব জাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ধর্ম বড় নেয়ামত। আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা ধর্ম সকল মানুষের জন্য। কারণ আল্লাহর নেয়ামত সবার জন্য সমান এ সহজলভ্য করেছেন। বাতাস সকল মানুষের জন্য। পানি সকল মানুষের জন্য। চন্দ্র-সূর্য সকল মানুষের জন্য। আর ইসলাম শুধু মুসলমানদের জন্য হবে? এটা হতেই পারে না। সকল মানুষের জন্য আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ধর্ম হলো ইসলাম। কুরআনে হাকীমে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা এরশাদ করেন-

"নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম। [সূরা: আল-ইমরান, আয়াত: ৩:১৯]

আল্লাহ সকল মানুষের স্রষ্টা ও মালিকঃ সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তা'আলা। সকলে তাঁরই ইবাদত করতে হবে। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা' আলা কুরআনে হাকীমে তাঁর ইবাদতের হুকুম দিতে গিয়ে এরশাদ করেন-

হে মানব সমাজ। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী দেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যার, তোমরা পরহেজগারি অর্জন করতে পারবে। [সূরা:বাকারা, আয়াত: ২:২১]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা (الناس ايها يا) (ইয়া আইয়ু হান্ নাস) শব্দ ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ হে মানুষগণ। এখানে "الناس" (নাস) শব্দ দ্বারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে আসবে, সকল মানুষ অন্তর্ভুক্ত। এখানে না আছে কোন যুগের শর্ত, না আছে কোন নির্দিষ্ট

অঞ্চল। বরং আল্লাহ্ তা'আলা সকল মানুষকে নির্দেশ দিচ্ছেন। হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ সহ সকল অমুসলিমরাও মানুষ। পৃথিবীর মানুষের সকলেই মানবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম সবার নবী: মহান আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে হাকীমে এরশাদ করেন-

"বলে দাও, হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, সমগ্র আসমান ও জমিনে তাঁর রাজত্ব একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কারো উপাসনা নয়। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন । সুতরাং তোমরা সবাই বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহ্র ওপর, তাঁর প্রেরিত উন্মী নবীর ওপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর এবং তাঁর সমস্ত কালামের ওপর। তাঁর অনুসরণ কর যাতে সরল পথ প্রাপ্ত হতে পার"। (সূরা আ'রাফ: আয়াত: ১৫৮)

আল্লাহতা'আলা এই আয়াতে (النَّاسُ) 'মানুষ' ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, ইয়াহুদী ইত্যাদি, সকলেরই নবী হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম কারণ তারা সকলেই মানুষ। উপরিউক্ত আয়াতে লক্ষ করলে আরো একটি বিষয় দেখতে পাওয়া যায়। এখানে جميعا ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ হলো 'সবাই'। এখানে বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে কোন শব্দ প্রয়োগ করা হয়নি। বরং সবার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ এই পৃথিবীতে আসবে, মহা নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) তাদের সকলের নবী। সকলের জন্য আল্লাহর রহমত স্বরূপ।

কুরআন সকলের জন্য: কুরআন সম্পর্কে আমাদের মাঝে একটি বড় ভুল ধারণা রয়েছে। আমরা সবাই মনে করি কুরআন শুধু মুসলমানদের কিতাব। কিন্তু সব ধর্মের সব মানুষের গ্রন্থ হলো আল-কুরআন। কুরআনে এ আল্লাহ তা'আলা বলেন-

"রমযান মাসই হলো সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। (সূরা বাকারাহ: আয়াত: ১৮৫)

উক্ত আয়াতের প্রতি লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই, (هُدًى لِلنَّاس) সমগ্র মানব জাতির জন্য হেদায়েত বলা হয়েছে। তাতে শুধু মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়নি, তা কেবল তোমাদের জন্য পথ প্রদর্শক। অতএব, আমরা যদি মনে করি যে, আল- কুরআন শুধু মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থ, তাহলে তা হবে নিছক ভুল ধারণা।

কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্য হলো সকল মানুষের হেদায়েত। শুধু মুসলমানের হেদায়েতের জন্য অবতীর্ণ হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলা সকল মানুষকে তাঁর ইবাদত করার নিদের্শ দিয়েছেন।

নবীগণের দাওয়াতের স্বরুপ ও বিষয়বস্তু : আদি কাল থেকে প্রথম নবী হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে নবীকুলের সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম এর সর্বসম্মত মূল উদ্দেশ্য (মিশন) ছিল তাওহীদের শিক্ষা, শিরকের খন্ডন এবং তাক্ওয়ার প্রতি আহবান। সৃষ্টির আদিকাল থেকে আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ.) এর মাধ্যমে ইসলামের

যে যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে যে ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়ে ছিল এর রশ্মি গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার পেছনে রয়েছে আল্লাহ পথে নিবেদিত প্রাণ, তাঁর প্রিয় নবী-রাসূলের ব্যাপক দাওয়াতি কাজ। তাঁদের দাওয়াতের বিষয় ছিল ঈমান, আমল, তাওহিদ, রিসালাত, আখেরাত ইত্যাদি। পৃথিবীর শুরু থেকেই মানুষ এক অভিন্ন দ্বীনের অনুসারী ছিল । মানুষকে আল্লাহ তা'আলা সীরাতুল মুসতাকীমে প্রতি দাওয়াত দেয়ার জন্য প্রথম থেকেই নবী-রাসূল প্রেরণে ধারা অব্যাহত রেখেছেন। তাঁদেরকে প্রেরণ করার মূল উদ্দেশ্যই ছিল মানুষকে সকল দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত

করা। আল্লাহ প্রদত্ত এক শিক্ষার দাওয়াত দেয়া। মানুষের যাবতীয় দ্বন্দের অবসান ঘটানো এবং অসভ্যতার অন্ধকার থেকে তাদেরকে ইমানের আলোয় আলোকিত পথে বের করে আনা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

"(শুরুতে) সমস্ত মানুষ একই দ্বীনের অনুসারী ছিল। তারপর (যখন তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল, তখন) আল্লাহ নবী পাঠালেন। যারা (সত্যপন্থীদের) সুসংবাদ শোনাত এবং (মিথ্যাশ্রয়ীদেরকে) ভীতি প্রদর্শন করত। আর তাঁদের সঙ্গে সত্যসম্বনিত কিতাব নাযিল করলেন। যাতে তাঁরা মানুষের মধ্যকার মতভেদ পূর্ণ বিষয় মীমাংসা করে দেয়।

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ.

(সূরা বাকারা: আয়াত: ২১৩)

একই এছাড়া ও সূরা ইউনুস ১৯ নং অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা একই কথা বলেছেন।

নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের বিষয়বস্তু মৌলিক ভাবে দুটি। এক. ঈমান দুই. আমল। অর্থাৎ আকীদা-বিশ্বাস ও শরীয়তের পালনীয় বিধি-বিধান।

একঃ আকীদা-বিশ্বাস: নবী-রাসুলগণের মাধ্যমে মানুষ যা কিছু অর্জন করেছে, তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান বিষয় হচ্ছে আকীদা-বিশ্বাস। এ আকীদা মানুষকে তার রবের সঙ্গে পরিচিত করে। রবের সাথে তার সম্পর্কের সঠিক পথ দেখায়। তাকে সৃষ্টির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত করে। আকীদার মাধ্যমে মানুষ তার ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সঠিক কর্মপন্থা জানতে সক্ষম হয়। এক কথায় মানুষের সঠিক কর্মপন্থা, প্রকৃত কল্যাণ ও সাফল্য আকীদার উপর নির্ভরশীল।

নবীগণের দাওয়াতের বিষয় বস্তুর মধ্যে আমরা প্রধানত তিন ধরনের আকীদার উল্লেখ দেখতে পাই

১. তাওহীদ : সকল নবী-রাসূল মানুষ কে তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাসের দাওয়াত দিয়েছেন। আল্লাহ এক। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। তাওহীদের এ বাণী আল্লাহ তাঁর সকল রাসূলের প্রতি ওহী রূপে অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন -

وَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِىْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ.

"আমি আপনার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাঁর প্রতি অবশ্যই এ ওহী পাঠিয়েছি যে, আমি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। অতএব, ইবাদত কর। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ২১, ২৫)

২. রিসালাতঃ নবী রাসূলগণ উম্মতকে স্বীয় রিসালাতের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর প্রেরিত, বিশ্বস্ত, তাঁরা জান্নাতের সুসংবাদবাহী। জাহান্নামের সতর্ককারী। একমাত্র তাদের অনুসরণের মাঝেই মানুষের কল্যাণ ও সফলতা নিহিত। এ মহান বিশ্বাসের প্রতি তাঁরা উম্মতকে দাওয়াত দিয়েছেন। যেমন: আমাদের প্রিয় নবীকে আল্লাহ তা' আলা বলেন, আমি একথা ঘোষণার নির্দেশ দিয়েছেন যে,

তোমাদের জন্য তাঁর (আল্লাহর) পক্ষ থেকে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।" (সূরা হুদ, আয়াত: ১১:২)

হযরত নূহ (আ.) নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিলেন,

"হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী। (সূরা নূহঃ ৭১:২)

হযরত মূসা ও হারুন (আ.)-কে আল্লাহ আদেশ করে বলেছেন, অতএব, তোমরা ফেরাউনের নিকট যাও এবং বল, আমরা তো বিশ্বজগতের পালনকর্তার রাসূল"। (সূরা: শুআরা; ২৬:১৬)

এমনিভাবে হযরত হুদ, সালেহ, লূত ও শুআইব (আ) নিজ নিজ উম্মত কে এ দাওয়াত দিয়েছিলেন।

৩. আখিরাত: নবীগণ মানুষকে পরকালের বিশ্বাসের দাওয়াত দিয়েছেন। মৃত্যু-পরবর্তী জীবন, ভালো- মন্দ কর্মের হিসাব, আমলনামা পরিমাপ করণ ও বিভীষিকাময় কিয়ামত দিবস এবং আখিরাতের কঠিন আযাবের ব্যাপারে তাঁরা উম্মতকে সর্তক করে গিয়েছেন যেমন, হযরত হুদ (আ.) নিজ উম্মতকে বলেছেন,

"আমি তো তোমাদের ব্যাপারে এক মহা দিবসের শাস্তির ভয় করি।" (সূরা:শু আরা, ২৬: ১৩৫)

হযরত নূহ (আ.)-কে আল্লাহ তা আলা আদেশ করে বলেছেন

"তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সর্তক করো, তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক আযাব আসার পূর্বে।" (সূরা নূহঃ ৭১:১)

আমাদের প্রিয় নবীজির প্রতি আল্লাহ তা' আলা আদেশ করেছেন,

"আপনি বলুন, সেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড়গুলিতে তিনি জীবন দান করবেন, যিনি তাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি সর্বপ্রকার সৃজন জানেন। (সূরা ইয়াসীন ৩৫: ৭৯)

এছাড়া আকীদার অন্যান্য শাখা যেমন, ফিরিশতা আসমানী কিতাব ও ভালো-মন্দের তাকদীরে বিশ্বাসের প্রতি ও নবীগণ মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন।

দুই ইবাদতঃ আকীদার পর দ্বীনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ইবাদত। সকল নবী-রাসূলের দাওয়াতে এ বিষয়ে অপরিসীম তাকিদ করা হয়েছে। মানব জাতির সৃষ্টির লক্ষ্য উদ্দেশ্যই হালো আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করা। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

আমি জিন ও মানুষকে এজন্যই সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আমার ইবাদত করে। (সূরা: যারিয়াত ৫১:৫৬)

ইবাদত অর্থ আল্লাহর উপাসনা । যেমন, নামায, রোযা, হজ, যাকাত, যিকির, তিলাওয়াত, ই'তিকাফ, কুরবানী ইত্যাদি।

সকল নবী-রাসূল নিজ উম্মতকে এক আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দিয়েছেন। (সূরা: আম্বিয়া ২১: ২৫) পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াতের বিবরণীতে বিভিন্ন ইবাদতের উল্লেখ পাওয়া যায়। আল্লাহর নবী হযরত ইসমাঈল (আ.) নিজ পরিবার -পরিজন কে নামায ও যাকাতের আদেশ করতেন। (সূরা: মারইয়াম ১৯:৫৫) হযরত ঈসা আ. মায়ের কোলে থাকা অবস্থায় কুদরতী ভাবে যেসব কথা বলেছিলেন, তন্মধ্যে একটি বাক্য ছিল, " আর আমাকে আল্লাহ নামাযও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন আমি জীবিত থাকি। (সূরা মারইয়াম ১৯:৩১) হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা আর্দেশ দিয়ে বলেছেন, "আর মানুষের মধ্যে হজের ঘোষণা করে দাও" (সূরা হজ ২২:২৭) আর কুরবানী আল্লাহ প্রত্যেক উম্মতের উপর নির্ধারণ করেছিলেন। (সূরা হজ ২২:৩৪) এমনিভাবে রোযা, জিহাদ ও পূর্বের নবীগণের যুগে ফরয ছিল। (সূরা বাকারা ২:১৮৩,২৪৬) হযরত দাউদ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর যিকিরে নিমগ্ন থাকতেন। (সূরা: ছোয়াদ: ৩৮:১৮)

তিন. মুআমালা বা লেনদেনঃ কিছু মুসলমান দ্বীন বলতে কেবল ব্যক্তিগত বিশ্বাস আর ইবাদতকেই বোঝে। হাট-বাজারে, আয়-রোযগারে দ্বীনের যেন কোনো প্রয়োজনই নেই। মূলত দ্বীনী শিক্ষার অভাব আর দেশে দেশে প্রচলিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটই এ ধারণা সৃষ্টির কারণ। অথচ মুআমালা-লেনদেন হচ্ছে ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়। ইসলামে এবং পূর্বের নবীগণের দাওয়াতেও এ বিষয়ে পরিষ্কার বিধি-নিষেধ রয়েছে। স্বয়ং আমাদের নবীজী (সা) একজন সচেতন ও আদর্শ

ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যাপকভাবে সাহাবায়ে কেরামের পেশা ও ছিল, ব্যবসা-বাণিজ্য। পৃথিবীব্যাপী বিগত দেড় হাজার বছরের মুসলিম শাসনামলেও ইসলামী অর্থনীতি সফলভাবে কার্যকর ছিল ।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, পৃথিবীর বহু অঞ্চলে ব্যবসায়ী মুসলমানদের মাধ্যমেই ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর লেনদেন বিষয়ক অসংখ্য নির্দেশনা বিদ্যমান।

আল্লাহর নবী হযরত মূসা (আ.) এর যুগে কারুন নামে এক ধনকুবের ছিল। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)'র মাধ্যমে তাকে অর্থনীতি বিষয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা জানিয়েছিলেন। যা ইসলামী নীতিমালার অংশ। আল্লাহ তা' আলা ইরশাদ করেন-

" আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তার মাঝে তুমি আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর।"

অর্থাৎ এ অর্থ-সম্পদের তুমি একচ্ছত্র মালিক নও। এসব আল্লাহর দান। অতএব, সম্পদকে তুমি আখিরাতের কল্যাণ অর্জনের মাধ্যম বানাবে এবং আয়-ব্যায়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত যাবতীয় হালাল-হারামের নীতি মেনে চলবে। কিন্তু তুমি তোমার দুনিয়ার অংশের কথা ভুলে যেও না" অর্থাৎ, দুনিয়াতে তোমার যেটুকু প্রয়োজন, তার কথাও স্মরণে রেখো। হালাল পন্থায় আয় কর। আর নিজের বৈধ প্রয়োজনে প্রয়োজন অনুপাতে ব্যয় কর

"আল্লাহ তোমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি তুমিও অন্যদের প্রতি অনুগ্রহ কর"।

অর্থাৎ তোমার সম্পদ যেহেতু আল্লাহর দান, সুতরাং তুমি ও আল্লাহর পথে মানুষকে দান কর। যাকাত আদায় কর। পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না (সূরা: কাসাস, ২৮:৭৭)

অর্থাৎ, সম্পদের অহমিকায় পড়ে অন্যদের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ শুরু করে দিও না। মানুষের অধিকার কেড়ে নিও না।

কিন্তু কারুন হযরত মূসা (আ.) এর এ দাওয়াতকে অহংকারের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে। পরিণামে আল্লাহ তাকে ও তার সম্পদকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দেন। (সূরা: কাসাস, ২৮:৭৮-৮১)

এমনিভাবে হযরত শুআইব (আ.) যখন তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা মানুষের বিক্রয়ের পণ্যদ্রব্যে ওজনে কম দিও না। তখন তারাও নবীর দাওয়াতে সাড়া না দিয়ে বরং বিদ্রূপ করে বলেছিল হে "শুআইব! তোমার নামায কি তোমাকে এ শিক্ষা দেয় যে, আমাদের বাপ- দাদারা যাদের উপাসনা করত, আমরা তাদের বর্জন করি অথবা আমরা আমাদের ধর্ম ধন-সম্পদে আমাদের যা ইচ্ছা, তা করা ত্যাগ করি? তুমি তো বড়ই সহনশীল ভালো মানুষ! (সূরা হূদ ১১:৮৭) পরিনামে তাদের প্রতিও আল্লাহর আযাব অবধারিত হয়েছিল। (সূরা: হূদ, ১১:৯৪-৯৫)

চার. মুআশারা তথা সামাজিক কর্তব্য ও অধিকার:

কেবল লেনদেনই নয়, সমাজব্যবস্থার সর্বত্র মানুষের কর্তব্য ও অধিকার নিশ্চিত করে একটি সুন্দর সমাজ গঠনে ও নববী দাওয়াতের কালজয়ী দিক নির্দেশনা রয়েছে। যেমনঃ যে কোনো সমাজের প্রথম পরিসর হচ্ছে পরিবার। পরিবারে বাবা-মা'র সঙ্গে সন্তানের আচরণ কীরূপ হবে, মা-বাবার সবল ও দুর্বল অবস্থায়, জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে কী কী হক রয়েছে সন্তানের উপর, তাঁদের খেদমত ও আনুগত্যের পর্যায়, ধরণ ও সীমা রেখা কী, তেমনি সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে মা-বাবার কর্তব্য কী, সন্তানের লালন-পালন, খাদ্য- পোষাক, আনন্দ- বিনোদন, পঠন-পাঠন এবং চরিত্র ও মানস গঠনের ক্ষেত্রে মাতা-পিতার কী কী করণীয় বর্জনীয় এবং লক্ষ্যণীয় বিষয় আছে, এসবই নববী দাওয়াতের বিষয় বস্তু।

সন্তান বড় হলে বিয়ে-শাদীর ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন, বিয়ের আয়োজন, বিয়ে পরবর্তী জীবনে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের অধিকার ও কর্তব্যসমূহ, পরিবারের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও এলাকাবাসীর হক বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত-অপরিচিত, মুসলমান, মেহমান ও রাস্তায় চলাচলকারী ব্যক্তির হক, কর্তার উপর কর্মচারীর হক, কর্মচারীর উপর কর্তার হক, সরকারের উপর জনগণের হক, জনগণের উপর সরকারে হক, মানুষের জান মালের নিরাপত্তা ও আইন-শৃংখলা রক্ষায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের হক, মানুষকে ঈমান-আমল ও হেদায়াতের পথ প্রদর্শনকারী দ্বীনী ব্যক্তিবর্গের হক ছোটদের উপর বড়দের হক, বড়দের উপর ছোটদের হক, গাছপালা, পশু-পাখি, প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবেশ ও আবহাওয়ার সুরক্ষা ও সদ্ব্যব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতিটি বিষয়ই নববী আদর্শ ও শিক্ষার অধীন। মহান আল্লাহর কুরআন, প্রিয় নবীজীর সুন্নাহ এবং এই উভয়ের আলোকে উম্মাহ বরেণ্য ইমামগণ কর্তৃক সংকলিত ইসলামী ফিকহ তথা আইনশাস্ত্রের গ্রন্থ সমূহে হাজার হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী এসব নির্দেশনা নীতিমালা ও কার্যবিধি যথাযথ সংরক্ষিত আছে। শুধু লিখিত আকারেই নয়, নবীযুগ থেকে আজ অবধি প্রতি যুগের দ্বীনদার মুসলমানগণ এর উপর প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমলও করে আসছেন।

পাঁচ. সিয়ায়ত তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থা : যে কোনো সভ্য সমাজেরই অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গন হচ্ছে তার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। সরকার, প্রশাসন, আইন, প্রতিরক্ষা, বিচার ও আদালতের অবস্থিতি ছাড়া কোনো সমাজ ব্যবস্থাই পূর্ণ অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। এ ক্ষেত্রটি ও নবীগণের দাওয়াতের আওতাভুক্ত। রাষ্ট্রব্যবস্থাপনাতে ও নববী দাওয়াতের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় রকম নির্দেশনা বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন যেন মানুষ ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। (সূরা হাদীদ ৫৭:২৫)। মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন।-

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেছেন, যেন তোমরা আমানত সমূহ তার পাওনাদারদের পৌছে দাও। আর যখন লোকদের মাঝে বিচার কর তখন ইনসাফের সাথে বিচার কর।' (সূরা নিসা; ৪:৫৮)

আল্লাহ তা'আলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম কে এ ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ করেছেন যে, "(হে নবী!) আপনি বলুন.....

আমাকে আদেশ করা হয়েছে তোমাদের মাঝে ন্যায় বিচার করতে। (সূরা: শুরা, ৪২:১৫)

পবিত্র কুরআনে অন্তত চারজন বিশিষ্ট নবীর রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। তাঁরা হচ্ছেন, হযরত ইউসুফ (আ.), হযরত দাউদ (আ.), হযরত সুলাইমান (আ.) এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স)

হযরত ইউসুফ (আ.) ছিলেন মিসরের অর্থ-সম্পদের ব্যবস্থাপক। [দ্র. সূরা ইউসুফ ১২: ৫৫,৫৬,১০১] গোটা রাজ্যের চরম দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর অর্থনৈতিক সুষম ব্যবস্থাপনার কথা সূরা ইউসুফে চমৎকার ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত দাউদ (আ.) ছিলেন এক শক্তিশালী রাজ্যের অধিপতি জনসাধারণের মামলা-মোকাদ্দমা মীমাংসার অঙ্গনে তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞ ও বাগ্মিতার কথা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। [দ্র. সূরা ছোয়াদ ৩৮:২০]

হযরত সুলাইমান (আ) ছিলেন নবুওত ও রাজ্যক্ষমতায় তার পিতা হযরত দাউদ (আ.) এর উত্তরাধিকারী [দ্র. সূরা নামল, ২৭:১৬]

তাঁকে আল্লাহ তা'আলা এমন রাজত্ব দান করেছিলেন, যা ইতিহাসে আর কাউকে দেয়া হয়নি। । [দ্র. সূরা; ছোয়াদ ৩৮:৩৫]

মানুষ, জিন, পশুপাখি, বাতাস সবকিছুকেই তাঁর অধীন করে দেয়া হয়েছিল। [দ্র. সূরা; ছোয়াচ্ছ ৩৮:৩৬-৩৭, সুরা: নামল ২৭:১৭]

আর আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম রাষ্ট্র ব্যবস্থার সবকিছুই তো পবিত্র কুরআন কেন্দ্রিক। নবীজীর বদর, উহুদ, খন্দক ও হুদায়বিয়ার অভিযানগুলোর কথা কুরআনে কারীমে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। কুরআনের অন্তত কয়েকশ আয়াতে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার অবকাঠামো, মূলনীতি ও রূপরেখা বিশদাকারে বিবৃত হয়েছে। আল্লাহ তা' আলা তাঁর প্রিয়নবীকে আদেশ করে বলেছেন-

"আর আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব নাযিল করেছি তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী ও সেগুলোর (বিষয়বস্তুর) সংরক্ষক রূপে। অতএব, আপনি তাদের মধ্যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুসারে ফায়সালা করুন। (সূরা মায়েদা ৫:৪৮)

আমাদের সমাজের কিছু মানুষ এটা মনে করেন যে, নবীগণের দাওয়াতের সঙ্গে রাষ্ট্র, আইন, আদালত ও বিচার ব্যবস্থার কোনো সম্পর্ক নেই, তাদের এ বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করা উচিত, তাদের এটা জানা উচিত যে, পূর্বের নবীগণ আসমানী কিতাবের আলোকে মানুষের মাঝে বিচার কার্য করতেন। [সূরা মায়েদা ৫:১৪৬]

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে শাসন করে না, তারা কাফির, যালিম. ও ফাসিক। [দ্র. সূরা মায়েদা, ৫:৪৪]

ছয়, উত্তম আখলাক: নববী দাওয়াতের আরেকটি বিষয়বস্তু হচ্ছে আখলাক। অর্থাৎ, সুন্দর স্বভাব ও আচরণ নবী রাসূলগণ নিজেরা যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ আখলাকের অধিকারী ছিলেন, তেমনি মানুষকে ও তাঁরা সেদিকে আহবান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম এর প্রশংসা করে বলেছেন।

“আর নিঃসন্দেহে আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী। (সূরা: কলম, ৬৮:৪)

এছাড়া অন্যান্য নবীগণের ব্যাপারেও সৎ, পুণ্যবান, অনুগত, ধৈর্যশীল, পবিত্র এবং অতি সত্যবাদীর মতো অসংখ্য চারিত্রিক গুণাবলির উল্লেখ হয়েছে। নবী রাসূলগণ

মানুষকে ও আল্লাহর নির্দেশমতো উত্তম আখলাকের তালীম দিয়েছেন। বরং নবীগণের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিল এটি।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- "যেমন আমি তোমাদের মারো একজন রাসূল পাঠিয়েছিও তোমাদেরই মধ্য থেকে, যিনি তোমাদের সামনে আমার আয়াত সমূহ পাঠ করেন, তোমাদের পবিত্র করেন, তোমাদের কিতাব ও গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় শিক্ষা দেন, যা তোমরা জানতে না" (সূরা বাকারা ২:১৫১)

এ আয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রেরিত রাসূলের চারটি দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। এক. আল্লাহর আয়াত সমূহ পাঠ করা। দুই. মানুষকে পরিশুদ্ধ করা। তিন ও চার কিতাব ও গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় শিক্ষা দেয়া। এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল দ্বিতীয়টি।" মানুষকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করা। অর্থাৎ তাদেরকে এমন বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তোলা যাতে তাদের স্বভাব - আচরণ এবং অভ্যন্তরীণ গুণাবলি অপবিত্র ভাবাবেগ ও অনুচিত চাহিদা মুক্ত হয়ে উন্নত বৈশিষ্ট্য মন্ডিত হয়ে ওঠে।

বলাবাহুল্য, এটাই সেই উত্তম আখলাকের দাওয়াত। যা নবীগণের অন্যতম মহান দায়িত্ব। এ আয়াত থেকে উত্তম আখলাকের সীমাহীন গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। আর এও জানা গেছে যে নববী দাওয়াতে উত্তম আখলাকের পরিধি অনেক বিস্তৃত। নিছক সৌজন্য ব্যবহার আর কৃত্রিম ভদ্রতাকে নববী দাওয়াতে 'উত্তম আখলাক' বলে না। এখানে উত্তম আখলাক শুরু হয় পরিচ্ছন্ন অন্তর থেকে। সমাপ্ত হয় বহিরাঙ্গের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে। এমনিভাব নববী উত্তম আখলাক কেবল পুঁথিগত বিদ্যা পড়ে অর্জিত দিয়ে হয় না। কামেল ব্যক্তিগণের প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে তা পরিপূর্ণ রূপে হাসিল হয়। হাদীস শরীফে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ حُسْنَ الأَخْلاقِ। "আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে উত্তম চরিত্রের পূর্ণাঙ্গতা প্রদানের জন্য। [মুয়াত্তা মালেক; হাদীস ২৬৩৩, ১৮৮৫, ৬৫১, মুসনাদে বাযযার, হাদীস ৮৯৪৯, সুনানে কুবরা, বায়হাকী, হাদীস ২০৭৮২)

উপরুক্ত বিষয়ের মধ্যে প্রধান ও মূল ভিত্তি হল আকীদা - বিশ্বাস। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অবশিষ্ট বিষয়ের সকল নীতি ও বিধানের মধ্যে আকীদার রং ও কালক বিদ্যমান। কারো আকীদা-বিশ্বাস যদি ঈমানদারের আকিদা- বিশ্বাস না হয়, তবে আল্লাহর কাছে তার ইবাদত, মু আমালা, মুআশারা সিয়াসত ও উত্তম আখলাকের কানাকড়ি মূল্যও নেই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

"আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আল্লাহ কেমন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন 'পবিত্র বাক্যের? (অর্থাৎ কালেমা তাওহীদ ও ঈমান সম্পর্কিত কথার) (তার দৃষ্টান্ত এমন,) যেমন উৎকৃষ্ট বৃক্ষ, যার শিকড় (যমিনে) প্রোথিত, আর তার শাখাগুলি আসমানে (বিস্তৃত)- (সূরা: ইবরাহীম ১৪:২৪)

মূলত ঈমান হচ্ছে সেই শিকড়। আর বাকি সব তার ডাল-পালা। নবী-রাসূলগণ মানুষের অন্তরে সর্বপ্রথম ঈমান নামের এ আসমানী বৃক্ষ রোপনের মেহনত করেছেন। এরপর পর্যায়ক্রমে সেই গাছে অন্যান্য শাখা-প্রশাখা যুগিয়েছেন। তবেই তা কাঙ্খিত ফল দান করেছে।

সকল নবী-রাসূল অভিন্ন আকীদারই দাওয়াত দিয়েছিলেন তাঁদের অনেক ইবাদত ও এক ছিল। তবে শরীয়তের কিছু কিছু শাখাগত বিষয়ে যুগ, কাল ও অবস্থার প্রয়োজনে আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন বিধান দান করেছেন। [দ্র. সূরা মায়েদা, ৫:৪৮]

তথ্যসূত্র: https://www.alkawsar.com/bn/article/2704/

দাওয়াত দেয়ার ইসলামি বিধান: দাওয়াত দেয়ার শরয়ী বিধান কি? ফরজে আইন, ফরজে কেফায়া, না সুন্নাত, নিম্নের আলোচনা থেকে আশা করি বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাযে।

ফরজে আইন: অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতী কাজ ঐ সময় ফরজ হবে যখন কুফর বিজয়ী থাকবে, সত্য পরাজিত থাকবে, দা'ঈর সংখ্যা হবে নিতান্তই কম, মন্দ কাজ হবে ব্যাপক, মুর্খতা ও অজ্ঞতা সর্বস্তরে বিরাজ করবে। এমতাবস্থায় ব্যক্তিগত ভাবে সাধ্যানুযায়ী অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াত ফরজে আইন

সুন্নাত: অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতী কাজ ঐ সময় সুন্নাত হবে, যখন দা'ঈদের সংখ্যা থাকবে পর্যাপ্ত দাওয়াতী সংগঠন চতুরদিকে ছড়িয়ে পরবে। হক বিজয়ী থাকবে। বাতিল থাকবে পরাজিত। রাষ্ট্র নিজেই দাওয়াতী কাজ আঞ্জাম দিবে। এই অবস্থায় সাধারণ মানুষের উপর দাওয়াতী কাজ করা সুন্নাত।

ফরজে কেফায়া: ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, অমুসলিম ভাই-বোনদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া ফরজে কেফায়া। অনেকে বলেছেন সাধ্যানুযারী ফরজে আইন। আমরা ফরজে কেফায়াই ধরে নিলাম। এবার আমাদের জানতে হবে ফরজে কেফায়া কাকে বলে?

ফরজে কেফায়া বলা হয় এমন হুকুম বা কাজ, যা সকল মুসলমানের উপর ফরজ । তবে সকলের পক্ষ থেকে যদি কিছু মানুষ ওই কাজ আদায় করে দেয়, তাহলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি প্রাপ্ত হবে না। যদি আদায় না করে তাহলে সকলেই গুনাহগার হবে।

সাধারণত ফরজে কেফায়া বলতে আমরা জানাজার নামাযকে বুঝি। কাফন দাফনসহ জানাজার নামায় সম্পূর্ণ করতে হলে কমপক্ষে চারজন লোকের প্রয়োজন। তাহলে ফরযে কেফায় আদায় হবে। যদি ফরযে কেফায়া আদায় না হয়, তাহলে ওই মহল্লার সকলেই গুনাহগার হবে এবং সমাপ্ত করার দায়িত্ব পড়বে পার্শ্ববর্তী সকল মুসলমানের উপর। যদি তারাও আদায় না করে, তাহলে পর্যায় ক্রমে সকল মুসলমান গুনাহগার হবে। তদ্রূপ অমুসলিমদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো হলো ফরজে কেফায়া। প্রত্যেক অমুসলিমদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য এমন কিছু লোক থাকতে হবে। যাদের মাধ্যমে তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে যায়। যদি সকলের কাছে দাওয়াত না পৌঁছে, তাহলে সকল মুসলমান গুনাহগার হবে।

জিম্মাদারী আদায়ের পদ্ধতি: দাওয়াতী কাজ যেহেতু আমাদের উপর ফরজ। এই কাজ আমাদের করতেই হবে। তবে সাধ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী একেক জনের কাজের

ধরন ও ভিন্ন হবে। বিষয়টি বুঝার সুবিধার্থে কুরআন থেকে তিনটি উদাহরণ দেখা যায়- আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নামলের মাঝে দুইটি প্রাণীর আলোচনা করেছেন।

পিপীলিকা: সুলাইমান আ. এর ঘটনায় আল্লাহ্ তা' আলা বলেছেন, "সুলাইমান যখন সৈন্যদের নিয়ে যাচ্ছিলেন পথে এক স্থানে পিপীলিকার দল গর্ত থেকে বাইরে বের হয়ে এসেছিল। পিপীলিকার রাণী যখন বুঝতে পারলো যে তারা সুলাইমান আ. এর সৈন্য দলের পায়ের নিচে পরে পিষ্ট হয়ে যাবে। তখন রাণী পিপীলিকার দলকে ডাক দিয়ে বললো তোমরা তোমাদের গর্তে প্রবেশ কর। অন্যথায় তোমরা সুলাইমান সৈন্যের পদদলিত হয়ে পিষ্ট হয়ে যাবে।" (সূরা: নামল, ১৮)

কুরআনে কারীম পিপীলিকাদের রাণীকে দা'ঈ হিসেবে পেশ করেছে। কতো ছোট একটি প্রাণী। ! তার অন্তরে ছোট একটি ব্যথিত হৃদয়! তার মধ্যে নিজ জাতিকে বিপদ থেকে বাঁচানোর কতো ফিকির। সে কোন মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি নিজ জাতিকে বিপদ থেকে বাঁচানোর ফিকির করেছে।

হুদহুদ পাখিঃ আল্লাহ তা'আলা সূরা নামলে হুদহুদ পাখির ঘটনা- আলোচনা করেছেন। হুদহুদ পাখি মুলকে সাবায় গেল। গিয়ে দেখল ওই দেশের রাণী বিলকিস এবং তার পুরো জাতি আল্লাহ্ তা'আলাকে ছেড়ে সূর্যের পূজা করছে। পাখি অস্থির হয়ে গেল। সে সরাসরি ওখানে লোকদের বুঝাতে পারলো না। কারণ তার ভাষা ভিন্ন, আর ওই দেশের ভাষাই ভিন্ন। পাখির ভাষা তারা বুঝতে পারতো না। সুলাইমান (আ.) পাখিদের ভাষা জানতেন। তাদের কথা বুঝতেন। তাই পাখি সুলাইমান আ. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে প্রতিবেশী দেশের খবর দিলো । বলল সেখানে শিরক হচ্ছে। ফলে আপনি দ্রুত কোন পদক্ষেপ নিন। সুলাইমান (আ.) হুদহুদের কথা শুনে খবরটি যাচাই- বাছাই করলেন । এরপর রাণী বিলকিসের কাছে দাওয়াতী পত্র পাঠালেন । এর ফলে রাণী বিলকিস ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন। [দ্র. সূরা: নামল ২০-৪০]

একটি সাধারণ পাখির প্রচেষ্টায় একটি দেশের রাণী ইসলাম কবুল করেছে। এর দ্বারা আমরা শিক্ষা অর্জন করতে পারি, আমরা যদি নিজে কোন কারণে দাওয়াতী কাজ আঞ্জাম না করতে পারি, তাহলে এমন লোককে এই কাজে নিয়োগ দেব, যে এই কাজ আঞ্জাম দিতে পারবে। আমরা যদি মাদ'উর ভাষা না বুঝি তাহলে মাদ'উর ভাষায় ইসলামী পুস্তিকা বই এবং কুরআন ইত্যাদি প্রকাশ করে বিতরণ করতে পারি।

আসহাবে কাহাফের কুকুর: সূরা কাহাফে আল্লাহঃ তা' আলা আসহাবে কাহাফের কুকুরের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। সেই সাত যুবক যুগের বাদশার সামনে হক্কের আওয়াজ উচু করে ছিল। ফলে পুরো রাষ্ট্র তাদের দুশমন হয়ে যায়। তারা তাদের জাতি থেকে দূরে এক স্থানে এসে একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়। তাদের সাথে ছিল একটি কুকুর, যা তাদের পাহারা দিচ্ছিলো এর দ্বারা বুঝা গেল যে, কেউ যদি নিজে দাওয়াতী কাজ না করতে পারে অন্যকে দিয়েও করাতে পারছে না তাহলে কমপক্ষে দা'ঈ ইলাল্লাহর সহযোগী ও পাহারাদারী হিসাবে কাজ করবে। দা'ঈদের প্রয়োজন মিটানোর চেষ্টা করবে।

'দা'য়ীর গুণাবলী

এখলাসঃ দা'ঈর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো এখলাস। এখলাস সম্পর্কে কুরআনের অনেকগুলো আয়াত ও হাদিস রয়েছে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- 'তাদের এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করবে। (সূরা:বাইয়্যিনাহ, ৫)

উত্তম আমলঃ উত্তম আমল দ্বারা উদ্দেশ্য এখলাসের সাথে আমল। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন

"যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন- কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়। (সূরা: মূলক, ২)

আত্মশুদ্ধিঃ দা'ঈর জন্য খুবই জরুরি আমলের মাধ্যমে তার আত্মাকে শুদ্ধ করা। তাদেরকে কুরআন ভৎসনা করেছে যারা অন্যের এসলাহের তো ফিকির করে, কিন্তু নিজেকে ভুলে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও? অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর। তবুও কি তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর না? (সূরা: বাকারা-৪৪)

মুমিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল? (সূরা সাফ-২)

দা'ঈর জন্য খুবই জরুার হলো সে ইসলামের যে কোন প্রকারের আহকামাতের উপর আমল করবে। চাই সেটা ফরয, নফল, কিংবা মুস্তাহাবই হোক না কেন। দা'ঈ সমাজে আর্দশ ব্যক্তি হবে। নিচে কিছু বিষয় উল্লেখ করা হলো-

নামায: নামায দ্বারা আমার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ফরজ নামায নয়। এটা ছাড়ার তো কোন উপায়ই নেই। উদ্দেশ্য হলো নামায আদায় করার ব্যাপারে তার কিছু বৈশিষ্ট্য থাকবে। দাঈ সর্বদা প্রথম কাতারে থাকবে। পিছনে থাকার অভ্যাস করবে না। নামায আদায়ের ক্ষেত্রে সুন্নাতের এহতেমাম করবে। কোন ধরনের অপূর্ণতা না রেখে পরিপূর্ণ সুন্নাত অনুযায়ী নামায আদায় করবে। এর দ্বারা লাভ হবে বাকী মানুষ তাকে আর্দশ মানবে। দাওয়াতের মাঝে এই আমলের প্রভাব সৃষ্টি হবে।

হযরত লোকমান আ. নিজ সন্তানদের উপদেশ দিলেন। “হে বৎস! নামায কায়েম কর। সৎকাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজ হতে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর নিশ্চয়ই এটা সাহসিকতার কাজ। (সুরা: লুকমান, ১৭)

হযরত লোকমান আ. এর উপদেশ ছিল দাওয়াতের জন্য। দাওয়াতী কাজের জন্য নামাযের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই তিনি নামাযের নসিহত করেছেন। দা'ঈদের দাওয়াতী কাজে সফলতার জন্য নফল ও সুন্নাতে মুআক্কাদা ইত্যাদি খুবই জরুরি। যেমন বিতর, তাহাজ্জুদ, চাশ্ত, আওয়াবীন, এশরাক ইত্যাদি আদায় করা।

কিয়ামুল লাইল: তাহাজ্জুদের নামায এমন এক ইবাদাত, যার দ্বারা দা'য়ী তার দাওয়াতের মধ্যে অসম্ভব প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। যার প্রমাণ হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম এই নামাযের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতেন। এই গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিদের প্রশংসা করেছেন। তিনি নিজে আমল করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। একই অবস্থা ছিল সাহাবা রা.-দের। তাহাজ্জুদের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন-

"রাত্রির কিছু অংশ কোরআন পাঠ সহ জাগ্রত থাকুন। এটা আপনার জন্যে অতিরিক্ত। হয়ত বা আপনার পালনকর্তা আপনাকে মোকামে মাহমুদে পৌঁছাবেন" (সূরা বনী ইসরাইল-৭৯)

দা'ঈরা হবেন তাহাজ্জুদ গুজার এবং কঠিন পরিশ্রমী। তাদের নেক আমল যেন বেশী থেকে বেশী হয়। আমলটি যেন হয় এখলাস ওয়ালা। আর নিজের ভুল-ত্রুটির জন্য এস্তেগফার করা। দা'ঈদের বৈশিষ্ট্যই হলো তারা সব ধরনের আমল করার পরেও মনে করা এটা খুবেই কম হয়ে গেছে। অক্ষমতার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া। দা'ঈদের জন্য খুবই জরুরি তাহাজ্জুদকে নিজের জীবনের একটি অংশ বানিয়ে নেওয়া। দাওয়াত কবুল হওয়া ও শক্তিশালী হওয়ার জন্য এটা খুবই জরুরি জিনিস।

রোযা: দা'ঈদের জন্য খুবই জরুরি রোযার গুরুত্ব দেওয়া। এখানে রোযা বলার দ্বারা ফরজ রোযা উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো নফল রোযা। যেমন - সোমবার, বৃহস্পতিবার, মাসে আইয়্যামে বীযের তিন রোযা, আশুরা ও আরাফার রোযা ইত্যাদি। এই রোযা দ্বীন ও দুনিয়ার কাজে ঈমানী শক্তি যোগায় দাঈদের জন্য এটা মৌলিক মাধ্যম। একই অবস্থা দান- খায়রাতের ক্ষেত্রে ও।

দা'ঈ কৃপণ হবে না: কৃপণ ব্যাক্তির ক্ষেত্রে মানুষ দুশমনি করে। প্রয়োজনের বেশী মাল খরচ করা উচিত। তবে এদিকেও লক্ষ রাখতে হবে যাতে এই অতিরিক্ত খরচ অপচয়ের কারণ না হয়। এতে হক গ্রহণের স্পৃহা সৃষ্টি হয়। এর দ্বারা সওয়াবও

হবে। দান-সদকার অনেক ফজিলত হাদিসে উল্লেখ রয়েছে। পাশাপাশি কৃপণতার ভয়াবহতার কথা ও আছে । মোট কথা দা'ঈদের জন্য কৃপণতা করা একেবারেই ঠিক না।

কুরআন তেলাওয়াতের গুরুত্বঃ কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াতে অভ্যস্ত, হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরি। বিশেষ করে দা'ঈদের জন্য খুবই জরুরি। তেলাওয়াতকে দা'ঈ তার জীবনের মৌলিক কাজ বানিয়ে নিতে হবে। কারণ কুরআন হলো আল্লাহর কালাম। মুসলমানগণ কুরআন থেকে সকল প্রকার জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। এই কুরআন তাকে সঠিক পথ দেখায়। কুরআন এমন ভাবে তেলাওয়াত করা যেন কুরআন তার আখলাক হয়ে যায়। কুরআন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার তাওফিক আল্লাহ্ আমাদের দান করুন। আমিন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম বলেন-" হযরত উসমান (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও উত্তম ঐ ব্যক্তি যে কুরআন শেখে এবং শিখায়।" (বুখারী- ৫০২৭)

মোট কথা, দাঈদের জন্য খুবই জরুরি জীবনের পাথেয় হিসাবে সকল প্রকারের নফল নামায, রোজা, দান- খায়রাত, তেলাওয়াত, জিকির আযকারের প্রতি বিশেষ - গুরুত্ব দেওয়া। কারণ এগুলো দাওয়াতী কাজে অনেক প্রভাব পড়ে।

ইলম ও জ্ঞানঃ ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য এই নয় যে, দা'ঈর সকল প্রকার জ্ঞান জানা থাকতে হবে। বরং দা'ঈর ওই বিষয়ের এলেম বা জ্ঞান থাকতে হবে, যে বিষয়ে মানুষকে আহবান করবে। যেসব বিষয় থেকে মানুষকে বাঁধা দিবে। আর দাই ঐ বিষয়ে নির্দেশ দিবে, যে বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন। দাঈ শুধু ঐ সব জিনিস থেকে বাধা দিবে যেসব বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) বাধা দিয়েছেন।

ইলম ও জ্ঞান মৌলিক গুণাবলির মধ্যে একটি গুণ। যা থেকে দা'ঈ বিমুখ হতে পারবে না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ইলমের অনেক মর্যাদা দান করেছে- সাধারণ মুসলমানের থেকে বেশী মর্যাদা দান করেছে- আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

"বলুন যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে যারা বুদ্ধিমান। (সূরা: যুমার; ৯)

আমলের পূর্বে ইলম অর্জন: "জেনে রাখুন, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আপনার ত্রুটির জন্য এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে আল্লাহ্ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত। (সূরা: মুহাম্মদ-১৯)

হযরত আবু দারদা (রা.) বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন- "যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের জন্য পথ চলে আল্লাহ্ তা'আলা তার (আমল) দ্বারা তাকে বেহেশতের পথসমূহের মধ্যে একটি পথে পৌঁছিয়ে দেন। এবং ফেরেশতাগণ দ্বীনী ইলম অন্বেষণ কারীদের সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানা সমূহ বিছিয়ে দেন। এছাড়া যারা আলেম তাদের জন্য আসমান ও জমিনে যারা আছেন, সকলেই আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও দু আ' করতে থাকেন। এমনি ভাবে গভীর পানির মাছ সমূহ ও (দুআ' করতে থাকে)। আলেমগণের ফজিলত (আলেম নন এমন) আবেদের উপর এরুপ, যেরূপ পূর্ণ চন্দ্রের ফজিলত অন্নান্য তারকারাজির উপর। নিশ্চয়ই আলেমগণ হলেন নবীগণের ওয়ারিস (উত্তরাধিকারী)। আর নবীগণ কোন দিনার বা দেরহামের মিরাস বা রেখে যান নি। উত্তরাধিকার বরং তারা এলেমকেই মিরাস হিসাবে রেখে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এলেম অর্জন করেছে সে মিরাসের পূর্ণ অংশ অর্জন করেছে। (আবু দাউদ- ৩৬৪১)

তাক্বওয়া:

তাক্বওয়ার উপর চলা দা'ঈদের জন্য খুবেই জরুরি। এটা ইবাদত কবুল হওয়ার মাধ্যম। আল্লাহ্ তা' আলা বলেন-

"যে লোক নিজে প্রতিজ্ঞা করবে এবং পরহেজগার হবে, অবশ্যই আল্লাহ্ পরহেজগারদের ভালোবাসেন। (সূরা: ইমরান, ৭৬)

নম্রতা: দাওয়াতী কাজের শুরু লগ্ন থেকে আম্বিয়া আ সেসব আদর্শ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা হলো নম্রতা, মুহাব্বাত ও ভালোবাসা। এ পদ্ধতি অবলম্বন করার কারণে মাদ'উ তাদের অন্তর উজাড় করে দিয়েছেন। নম্রতার কারণে দাওয়াত কবুল করে। দা'ঈদের উচিত মানুষের সাথে ভালো কথা বলা, সুন্দর কথা বলা। চাই লোকটি ভালো হোক কিংবা খারাপ হোক। ভালো কথার প্রভাব তার উপর পড়বে। দা'ঈদের জন্য জরুরি মানুষের সাথে নম্রতা অবলম্বন করা। তার প্রতি দরদি হওয়া। নিজেকে চিকিৎসক মনে করা। আর মাদ'উকে রুগী মনে করা। তাদের চিকিৎসা করতে হবে। আর মানুষের অন্তরের রোগের চেয়ে বড় কোন রোগ হতে পারে না । দাঈদের জন্য জরুরি হল তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কুরআনী শিক্ষার উপর আমল করে নম্রতা অবলম্বন করা, ভালো কথা বলা।

ক্ষমা: দা'ঈদের জন্য ক্ষমার মতো মহান গুণে গুণান্বিত হওয়া খুবই জরুরি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

“তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন কসম না খায় যে, তারা আত্মীয়- স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর পথে হিজরত কারীদের -কে কিছুই দেবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষক্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম করুণাময় (সূরা-নূর-২২)

রাহমাতুল্লিল আলামিন (সা) এর অবস্থার পর তিনি যেমন ক্ষমা করে দিয়েছেন। তেমনি ভাবে দাঈদের জন্য জরুরি, নবীজীর ওয়ারিস হিসাবে তার বাস্তব জীবনে বাস্তবায়িত করে আমলি নমুনা পেশ করা। আমলী ভাবে এই সুন্নাতের হেফাজত করা। পূর্বের নবীগণ ও এ ধরনের নির্যাতন সহ্য করেছেন এবং নিজ জাতিকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। দা'ঈদের জন্য জরুরি হল তারা আম্বিয়া আ. এর জীবনীর উপর এবং তাদের দাওয়াতী কার্যক্রমের উপর গভীর পড়াশোনা করা। তার উপর আমল করে ঐ ফল গ্রহণ করা যা করেছেন আম্বিয়া (আ.)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম সর্বদা সাহাবায়ে কেরাম রা. কে উদ্বুদ্ধ করতেন। তারা যেন মন্দের বদলা মন্দ দিয়ে না দেয়। তাদেরকে ক্ষমা করতে উদ্বুদ্ধ করতেন এবং উত্তম চরিত্র ও কষ্ট সহ্য করার দাওয়াত দিতেন।

এতেদাল: কারো ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া না করা। কেউ কারো কোন কথা বললে কোন যাচাই-বাছাই ছাড়াই তাকে নিন্দা করা, দা'ঈদের জন্য মোটেই উচিৎ না। এর জন্য অনেক সময় লজ্জিত ও হতে হয়। তাই মেজাজে সাম্যতা এতেদাল থাকতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর কর, তখন যাচাই করে নিও এবং যে তোমাদেরকে সালাম করে তাকে বলো না যে, তুমি মুসলমান নও। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ কর, বস্তুতঃ আল্লাহ্র কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে। তোমরা ও এমনি ছিলে ইতোপূর্বে, অত: পর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব, এখন অনুসন্ধান করে নিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের কাজ-কর্মের খবর রাখেন। (সূরা: নিসা, ৩১)

ধৈর্য বা সবর: দা'ঈদের মধ্যে এই গুণ থাকা খুবই জরুরি সবর গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণ।

সবরের সংজ্ঞা: সবর অর্থ দৃঢ় দেখানো। অস্থিরতা ও পেরেশানী প্রকাশ না করা, অপেক্ষা করা

সবরের হাকিকতঃ সবর হলো অন্তরের গুণাবলীর মধ্য থেকে উত্তম একটি গুণ। সেই কারণে সে ঐ সব কাজ থেকে বিরত থাকে যা সুন্দর ও উত্তম না। এটা আধ্যাত্মিক শক্তিগুলোর একটি। যার দ্বারা মুআমালাত এবং অবস্থা ঠিক হয়ে যায়।

জুননূন (রা) বলেন- সবর হলো পাপকর্ম থেকে দূরে থাকা। পরীক্ষার সময় কষ্ট সহ্য করা। এক বর্ণনা অনুযায়ী সবর হলো বিপদের সময় ভালো ব্যবহার করা। অর্থ মুসিবতের সময় কোন ধরনের অভিযোগ না করা।

খাওয়াস বলেন যে, সবর দ্বারা উদ্দেশ্য, কিতাব ও সুন্নাতের আহকামাতের উপর অনড় ও দৃঢ় থাকা।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন- إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে আছেন" (সূরা বাকারা, ১৫৩)

উত্তম চরিত্র: আল্লাহ তা' আলা রাসূলুল্লাহর (সা) এর পরিচয় করিয়েছেন -" আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী" (সূরা: কলম, ৪)

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম মানুষের মধ্যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন" (বুখারী-৬২০৩)

ক্রোধ: ক্রোধ এমন একটি রোগ যা মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। এটা আখলাকে রাফায়েল গুলোর মধ্যে একটি। এখানে ক্রোধ বর্জন দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, একেবারে ক্রোধকে মিটিয়ে দিবে। উদ্দেশ্য হলো খুব দ্রুত যেন -ক্রোধ না আসলেও তা নিয়ন্ত্রণ করে ভালো কাজে রুপান্তর করা উচিত। মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

"যারা বড় গুনাহ ও অশ্লীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধান্বিত হয়েও ক্ষমা করে। (সূরা: রাদ্ব, ৩৭)

অর্থাৎ ক্রোধের প্রয়োগ জুলুম, ক্রোধের নিয়ন্ত্রণ ইনসাফ, আর ক্রোধের রুপান্তর হলো ইহসান।

ইসলাম প্রচারে নবীদের দাওয়াত ও সংগ্রামঃ

নবী-রাসুলগণ শ্রেষ্ট মানুষ। তাঁরা আল্লাহর মনোনীত ও নিযুক্ত। তাঁদের কাছে মহান আল্লাহ অহি পাঠিয়েছেন, কিতাব পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে বলেছেন। মহান আল্লাহ আল কুরআনে হযরত মুহাম্মদ (সা) সহ পঁচিশজন নবী রাসূলের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁদের আর্দশ ও শ্রেষ্ঠ জীবনের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁরা একদিকে ছিলেন সত্য ও সঠিক জ্ঞনের অধিকারী। অন্যদিকে ছিলেন উন্নত চরিত্র ও নিষ্পাপ জীবনের অধিকারী।

আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর দাসত্ব করার জন্যে। তাঁর হুকুম পালন করার জন্যে। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করার জন্যে। সেই সাথে পৃথিবীটাকে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালনা করার জন্যে। এই হলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ নবীদের পাঠিয়েছেন মানুষকে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানিয়ে দিতে এবং কথাটা বার বার তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে। হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মহান আল্লাহ যাঁদের নবী নিযুক্ত করেছেন, তাঁরা সারা জীবন মানুষকে আল্লাহর পথে ডেকেছেন। মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে বলেছেন। নফসের তাড়না এবং শয়তানের পথ পরিহার করে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলতে তাদের অনুপ্রাণিত করেছেন।

নবীরা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষ যদি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তাঁর সন্তুষ্টির পথে জীবন যাপন করে, তবে মৃত্যুর পর যে চিরন্তন জীবন

আছে, সেখানে তারা মহাসুখের জান্নাত লাভ করবে। কিন্তু যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করবে না, মৃত্যুর পরের জীবনে তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি আর শাস্তি। মহান আল্লাহ তা' আলা বলেন সঠিক আমরা আমাদের রসূলদের স্পষ্ট নিদর্শন ও পথে নির্দেশিকাসহ পাঠিয়েছি। (সূরা, হাদিদ, ২৫)

নবী শব্দের অর্থ 'সংবাদ বাহক', আর রসূল শব্দের অর্থ 'বাণী বাহক। নবী-রাসূলগণ আল্লাহর বাণী এবং আল্লাহ পক্ষ থেকে সঠিক পথের সংবাদ মানুষে কাছে পৌঁছে দিয়েছেন বলেই তাঁদের নবী এবং রাসূল বলা হয়। সকল রাসূলই নবী ছিলেন। তবে সকল নবী রাসূল ছিলেন না। অনেক নবীর কাছে আল্লাহর তা' আলা শুধু অহি পাঠিয়েছেন। যাঁরা সাধারণভাবে অহি লাভ ছাড়া কিতাব ও লাভ করেছেন, তাঁরাই ছিলেন রাসূল।

প্রথম নবী ছিলেন পৃথিবীর প্রথম মানুষ হযরত আদম আ. সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা.। তাঁর পরে পৃথিবীতে কোনো নবী আল্লাহ নিযুক্ত করবেন না। পৃথিবীতে আল্লাহ তা' আলা কতজন মানুষকে নবী নিযুক্ত করেছেন, সেকথা মানুষের জানার উপায় নেই। একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, আল্লাহ তা'আলা এক লক্ষ বিশ হাজার নবী পাঠিয়েছেন। এদের মধ্যে তিনশত পনেরজন ছিলেন রসুল। তবে তাঁদের প্রকৃত সংখ্যা আল্লাহই ভালো জানে আল কুরআনে পঁচিশজন নবীর নাম উল্লেখ হয়েছে তাঁরা সকলেই রসূল ছিলেন। কুরআনে উল্লেখিত নবী-রসূলগণ হলেন: ১. আদম ২.নূহ ৩.ইদরিস ৪.হূদ ৫.সালেহ ৬.ইবরাহিম ৭.লূত ৮.ইসমাঈল ৯.ইসহাক ১০.ইয়াকুব ১১.ইউসুফ ১২.শুয়াইব ১৩.আইউব ১৪.যুল কিফল ১৫.মূসা ১৬.হারূণ ১৭.দাউদ ১৮.সুলাইমান ১৯.ইলিয়াস ২০.আলইয়াসা ২১.ইউনুস ২২.যাকারিয়া ২৩. ইয়াহ্ইয়া ২৪.ঈসা ২৫.মুহাম্মদ (আলাইহিমুস সলাতু ওয়াস সালাম)

বাকি নবী রসূলগণের নাম কুরআনে উল্লেখ হয় নি। তবে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

তিনি সকল জাতির কাছেই নবী পাঠিয়েছেন এবং প্রতিটি মানব বসতিতেই নবী পাঠিয়েছেন। [দ্র. ফাত্বির, ২৪ এবং আর-রা'দ, ৭]

সকল নবী একই দ্বীনের বাহক ছিলেন। তাঁরা সকলেই আল্লাহর নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা মানুষকে

১. এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিয়েছেন

২. আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করতে নিষেধ করেছেন

৩. এক আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব করতে বলেছেন

৪. আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে বলেছেন।

৫. আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী সমাজ পরিচাল করতে বলেছেন। সুবিচার করতে বলেছেন।

৬. ঈমানের ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্ব গড়তে ও হানাহানি পরিহার করতে বলেছেন।

৭. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে এবং তাঁর অসন্তুষি থেকে আত্মরক্ষা করতে বলেছেন।

৮. জাহান্নাম থেকে বাঁচতে ও জান্নাতের পথে চলতে বলেছেন।

স্বীয় কওমের প্রতি হযরত নূহ (আঃ)-এর দাওয়াত:

"আবুল বাশার ছানী" ابو البشر الثاني বা মানব জাতির দ্বিতীয় পিতা বলে খ্যাত নূহ (আঃ) ছিলেন পিতা আদম (আ) এর দশম অথবা, অষ্টম অধঃস্তন পুরুষ। অর্থাৎ আদম (আ.) থেকে নূহ (আ.) পর্যন্ত প্রায় দশ শতাব্দীর ব্যবধান ছিল। তিনি ছিলেন দুনিয়াতে প্রথম রাসূল। [দ্র. মুসলিম হা/ ৩২৭ 'ঈমান' অধ্যায় ৮৪ অনুচ্ছেদ]

মানব কুলে শিরক ও কুসংস্কারের আবির্ভাব ঘটে এবং তা বিস্তৃতি লাভ করে। ফলে তাদের সংশোধনের জন্য আল্লাহ নূহ (আ.) কে নবী ও রাসূল করে পাঠান। তিনি সাড়ে নয়শত বছরের দীর্ঘ বয়স লাভ করেছিলেন এবং সারা জীবন পথভোলা মানুষকে পথে আনার জন্য দাওয়াতে অতিবাহিত করেন। কিন্তু তাঁর কত্তম তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে আল্লাহর গযবে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মহান আল্লাহ তা' আলা বলেন-

আমি নূহকে প্রেরণ করেছিলাম তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি একথা বলেঃ তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর, তাদের প্রতি মর্মন্তদ শাস্তি আসার আগে। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্যে স্পষ্ট সতর্ককারী। এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার এবাদত কর, তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার নির্দিষ্টকাল যখন হবে, তখন অবকাশ দেয়া হবে না, যদি তোমরা তা জানতে! (সূরা নূহ, ১-৪)

অতঃপর তিনি তাদেরকে শিরক পরিত্যাগ করে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর ইবাদতে ফিরিয়ে আনার জন্য বা বান্দার উপর আল্লাহর অসংখ্য অনুগ্রহ ও অগণিত নেয়ামতরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ কিভাবে সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। এবং সেখানে চন্দ্রকে রেখেছেন আলোরূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে উদগত করেছেন। অতঃপর তাতে ফিরিয়ে নিবেন এবং আবার পুনরুত্থিত করবেন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে ভূমিকে করেছেন বিছানা। যাতে তোমরা চলাফেরা কর প্রশস্ত পথে। (সূরা: নূহ, ১৫-২০)

নূহ (আ.) স্বীয় কওমকে দিন-রাত দাওয়াত দিতে থাকেন। তিনি তাদেরকে প্রকাশ্যে ও গোপনে বিভিন্ন পন্থায় ও পদ্ধতিতে দাওয়াত দেন। কিন্তু ফলাফল হয় নিতান্ত নৈরাশ্যজনক। তাঁর দাওয়াতে অতিষ্ট হয়ে তারা তাঁকে দেখলেই পালিয়ে যেত। কখনো কানে আঙ্গুল দিত। কখনো তাদের চেহারা কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলতে। তারা তাদের হঠকারিতা ও জিদে অটল থাকত এবং চরম ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত। [দ্র. নূহ ৭১/৬-৯৯]

নূহ বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় আমাকে অমান্য করেছে আর অনুসরণ করছে এমন লোককে, যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কেবল তার ক্ষতিই বৃদ্ধি করছে। আর তারা ভয়ানক চক্রান্ত করছে। তারা বলছেঃ তোমরা তোমাদের

উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে। (সুরা: নূহ, ২১-২৩)

জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য নূহ-এর দাওয়াত কে ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক আন্দোলন বলে আখ্যায়িত করে কাফের নেতা বলল,

তখন তার সম্প্রদায়ের কাফের-প্রধানরা বলেছিলঃ এ তো তোমাদের মতই একজন মানুষ বৈ নয়। সে তোমাদের উপর নেতৃত্ব করতে চায়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে ফেরেশতাই নাযিল করতেন। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এরূপ কথা শুনিনি। সে তো এক উম্মাদ ব্যক্তি বৈ নয়। সুতরাং কিছুকাল তার ব্যাপারে অপেক্ষা কর। (সূরা মুমিনূন, ২৪-২৫)

তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও মিথ্যারোপ করেছিল। তারা মিথ্যারোপ করেছিল আমার বান্দা নূহের প্রতি এবং বলেছিলঃ এ তো উম্মাদ। তাঁরা তাকে হুমকি প্রদর্শন করেছিল। (সূরা ক্বমার ৯)

নূহ (আঃ) বললেন-হে আমার জাতি! দেখ তো আমি যদি আমার পালনকর্তার পক্ষ হতে স্পষ্ট দলীলের উপর থাক, আর তিনি যদি তাঁর পক্ষ হতে আমাকে রহমত দান করে থাকেন, তারপরেও তা তোমাদের চোখে না পড়ে, তাহলে আমি কি উহা তোমাদের উপর তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই চাপিয়ে দিতে পারি ? (সূরা:হূদ-২৮)

তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের বাচনিক উপদেশ এসেছে যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে, যেন তোমরা সংযত হও এবং যেন তোমরা অনুগৃহীত হও। (সূরা: আ'রাফ, ৬৩)

অতঃপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। আমি তাকে এবং নৌকাস্থিত লোকদেরকে উদ্ধার করলাম এবং যারা মিথ্যারোপ করত, তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয় তারা ছিল অন্ধ। (আরাফ ৬৪)

আর হে আমার জাতি! আমি তো এজন্য তোমাদের কাছে কোন অর্থ চাই না; আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহর জিম্মায় রয়েছে। আমি কিন্তু ঈমানদারদের তাড়িয়ে দিতে পারি না। তারা অবশ্যই তাদের পালনকর্তার সাক্ষাত লাভ করবে। বরঞ্চ তোমাদেরই আমি অজ্ঞ সম্প্রদায় দেখছি। আর হে আমার জাতি! আমি যদি তাদের তাড়িয়ে দেই তাহলে আমাকে আল্লাহ হতে রেহাই দেবে কে? তোমরা কি চিন্তা করে দেখ না? আর আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার রয়েছে এবং একথাও বলি না যে, আমি গায়বী খবরও জানি; একথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা; আর তোমাদের দৃষ্টিতে যারা লাঞ্ছিত আল্লাহ তাদের কোন কল্যাণ দান করবেন না। তাদের মনের কথা আল্লাহ ভাল করেই জানেন। সুতরাং এমন কথা বললে আমি অন্যায় কারী হব। (সূরা: হূদ, ২৯-৩০,৩১)

তারা বলল, আমরা কি তোমাকে মেনে নেব যখন তোমার অনুসরণ করছে ইতরজনেরা? নূহ বললেন, তারা কি কাজ করছে, তা জানা আমার কি দরকার? তাদের হিসাব নেয়া আমার পালনকর্তারই কাজ; যদি তোমরা বুঝতে! আমি মুমিনগণকে তাড়িয়ে দেয়ার লোক নই। আমি তো শুধু একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী। (সূরা শো'আরা ১১১-১১৫)

সে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমি কখনও ভ্রান্ত নই; কিন্তু আমি বিশ্বপ্রতিপালকের রসূল। তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাই এবং তোমাদেরকে সদুপদেশ দেই। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমনসব বিষয় জানি, যেগুলো তোমরা জান না। (সূরা: আ'রাফ ৬১-৬২)

আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তাই দেবেন। (সূরা: শো' আরা ১০৯)

তারপরও যদি বিমুখতা অবলম্বন কর, তবে আমি তোমাদের কাছে কোন রকম বিনিময় কামনা করি না। আমার বিনিময় হল আল্লাহর দায়িত্বে। আর আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে যেন আমি আনুগত্য অবলম্বন করি। (ইউনুস, ৭২)

হযরত নূহ (আ) সুদীর্ঘ জীবনে, তিনি এক পুরুষের পর দ্বিতীয় পুরুষকে অতঃপর তৃতীয় পুরুষকে শুধু এই আশায় দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন যে, তারা ঈমান আনবে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী অক্লান্তভাবে দাওয়াত দেওয়া সত্ত্বেও তারা ঈমান আনেনি। তারা নূহ (আ.)- এর দাওয়াতকে তাচ্ছিল্য ভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল। কওমের নেতারা বলন,

তারা বলল, হে নূহ যদি তুমি বিরত না হও, তবে তুমি নিশ্চিতই প্রস্তরাঘাতে নিহত হবে। (সূরা: শো' আরা, ১১৬)

নূহ (আ.) তাদের দিবারাত্রি দাওয়াত দেন। কখনো গোপনে কখনো প্রকাশ্যে অর্থাৎ সকল পন্থা অবলম্বন করে তিনি নিজ কওমকে দ্বীনের পথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন। সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি দাওয়াত দিয়েছি; কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে। আমি যতবারই তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, ততবারই তারা কানে অঙ্গুলি দিয়েছে, মুখমন্ডল বস্ত্রাবৃত করেছে, জেদ করেছে এবং খুব ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি, অতঃপর আমি ঘোষণা সহকারে প্রচার করেছি এবং গোপনে চুপিসারে বলেছি। [দ্র নূহ, ৫-৯]

এই সুদীর্ঘ দাওয়াতী যিন্দেগীতে তিনি যেমন কখনো চেষ্টায় ক্ষান্ত হননি, তেমনি কখনো নিরাশ ও হননি। সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নানাবিধ নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েও তিনি ছবর করেন। বারবার আশাবাদী হয়ে তিনি সবাইকে দাওয়াত দিতে থাকেন। আর তাদের জন্য দো' আ করে বলতে থাকেন, " হে আমার পালনকর্তা তুমি আমার কওমকে ক্ষমা কর কর। কেননা তারা জানে না।" (তাফাসীর কুরতুবী, সূরা: নূহ)

ওদিকে তাঁর সম্প্রদায়ের অনীহা, অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য এবং ঔদ্ধত্য ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। বলা চলে যে, তাদের অহংকার ও অত্যাচার চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। ফলে এক পর্যায়ে নূহ আ. স্বীয় কওমকে ডেকে বললেন, আর তাদেরকে শুনিয়ে দাও নূহের অবস্থা যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমাদের

মাঝে আমার অবস্থিতি এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের মাধ্যমে নসীহত করা ভারী বলে মনে হয়ে থাকে, তবে আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি। এখন তোমরা সবাই মিলে নিজেরদের কর্ম সাব্যস্ত কর এবং এতে তোমাদের শরীকদেরকে সমবেত করে নাও, যাতে তোমাদের মাঝে নিজেদের কাজের ব্যাপারে কোন সন্দেহ-সংশয় না থাকে। অতঃপর আমার সম্পর্কে যা কিছু করার করে ফেল এবং আমাকে অব্যাহতি দিও না। তারপরও যদি বিমুখতা অবলম্বন কর, তবে আমি তোমাদের কাছে কোন রকম বিনিময় কামনা করি না। আমার বিনিময় হল আল্লাহর দায়িত্বে। আর আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে যেন আমি আনুগত্য অবলম্বন করি। তারপরও এরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। সুতরাং তাকে এবং তার সাথে নৌকায় যারা ছিল তাদের কে বাঁচিয়ে নিয়েছি এবং যথাস্থানে আবাদ করেছি। আর তাদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছি যারা আমার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং লক্ষ্য কর, কেমন পরিণতি ঘটেছে তাদের যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। (সুরা: ইউনুস, ৭১-৭৩)

তথ্যসূত্র:

http://ww.manabadhikarkhabar.com/details.php?id=1616

স্বীয় কওমের প্রতি হযরত হূদ (আ.) এর দাওয়াত:

হযরত হূদ (আ.) ছিলেন আদ জাতির নবী। আদের যুগ খ্রীষ্ঠ: পূর্ব দুহাজার অব্দ বলে ধারণা করা হয়। পবিত্র কুরআনে আদকে নূহের জাতির পরবর্তী জাতি, আখ্যা দিয়ে মূলত: নূহের জাতির উত্তরাধিকারী হিসাবেই তাদেরকে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

হূদ (আ) আদ কওমকে আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস ও তাঁর ইবাদতের প্রতি আহবান জানান এবং মানবের উপর অত্যাচার করা থেকে তাদেরকে বারণ করেন। কিন্তু তারা তাঁর কথায় কান দিল না বরং অত্যন্ত নির্লজ্জ ভাবে তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করতে লাগলো। তারা দম্ভভরে ঘোষণা করলো কে আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী? কিন্তু হূদ (আ) অনবরত : তাদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। তিনি তাদেরকে

আল্লাহর আযাবের ভয় দেখান এবং দাম্ভিকতা ও অবাধ্যতার কুফল বর্ণনা করে তাদেরকে নূহের ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি তাদের সম্বোধন করে বলেন, হে আমার কওম নিজেদের দৈহিক শক্তি রাজনৈতিক পরাক্রমের উপর তোমরা দম্ভ করো বরং আল্লাহর শোকর আদায় কর এজন্য যে তিনি তোমাদেরকে এই প্রাচুর্য প্রদান করেছেন, নূহের জাতি ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ার পর তোমাদেরকে ভূমির অধিকারী করেছেন এবং তোমাদের আয়েশ আরাম ও সুখ শান্তির ব্যবস্থা করেছেন। অতএব তাঁর নিয়ামত ও অবদান সমূহের কথা ভুলে যেয়ো না এবং মানুষের গড়া এ সব মূর্তির উপাসনা থেকে বিরত হও। কেননা এর না তোমাদের কোন উপকার করতে পারবে, আর না অপকার। জীবন-মৃত্যু, লাভ-ক্ষতি সবই আল্লাহর হাতে। হে আমার কত্তম এটা সত্য যে তোমরা দীর্ঘদিন যাবত আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত রয়েছ। কিন্তু এখন যদি তোমরা তওবা বা অনুশোচনা কর এবং দুষ্ককর্ম থেকে বিরত হও তবে তাঁর করুণা ও রহমত এ প্রশস্ত তিনি তোমাদের মাফ করে দেবেন। তোমরা তার দিকে প্রত্যাবর্তন কর - তিনি তোমাদের গ্রহণ করবেন। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, পবিত্র জীবন-যাপন কর, তিনি তোমাদের দ্বিগুণ ত্রিগুণ উন্নতি প্রদান করবেন। তোমাদেরকে আরো বেশি সম্মানিত করবেন এবং তোমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি আরো বৃদ্ধি করে দিবেন। কিন্তু হতভাগারা হুদের এ নসীহত গ্রহণ করল না। তাদের অবাধ্যতা একেবারে চরমে গিয়ে পৌঁছলো। তাই চরম আযাব ও তাদের উপর আপতিত হলো। একাধারে আট দিন এবং সাতরাত প্রবল ঝঞ্জাবায়ু প্রবাহিত হলো এবং তা তাদেরকে, তাদের বসত-বাটিকে একে বারে লন্ড ভন্ড করে দিল। সুস্থ সবল দানবতুল্য মানব, যারা ধরাকে সরা জ্ঞান করত তাদের দেহ ধরা পৃষ্ঠে এমনভাবে পরে রইল যেমন প্রবল ঝড় তুফানের আঘাতে অসাড় ও ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে থাকে ডাল-পালা যুক্ত বড় বড় বৃক্ষরাজি। [দ্র সূরা: আল-আনআম, ১২৪, সূরা: আল আরাফ ৬৫-৭২, সুরা: হূদ ৬০, সূরা: আয-যারিয়াত-৪১-৪২, সূরা আল-ক্বামার-১৮-২১, সুরা: আল-ফজর-৬-৮)

তথ্যসূত্র:

https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=15&chapter=2130

স্বীয় কওমের প্রতি হযরত সালেহ (আ) এর দাওয়াত:

আল্লাহ তা'আলার একটাই চিরান্তন নিয়ম। তিনি মানবের হিদায়তের জন্য তাদেরই মধ্য থেকে নবী- রাসূল মনোনীত করে থাকেন। তাই নবী স্বীয় কওমকে ন্যায় ও সত্যের পথ দেখান এবং সর্বপ্রকার পথভ্রষ্টতা ও অন্যায় থেকে বেঁচে থাকার প্রতি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন। এ কাজ করতে গিয়ে তাঁরা বাস্তব উদাহরণ হিসাবে অতীত কত্তমসমূহের ঘটনাদি বর্ণনা করেন।

যাতে মানব বুঝতে পারে অতীতের যে সব কত্তম নিজেদের রাসূলের হিদায়েত অনুসরণ করেছিল তারা দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি ও সৌভাগ্য লাভ করেছে এবং যারা নবী-রাসূলের কথা অস্বীকার করেছিল, তাদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল তাদের পরিণতি কি হয়েছিল।

হযরত সালেহ (আ.) কে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কত্তম সামুদ এর নিকট নবী নিযুক্ত করেন। আল্লাহ বলেন

সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই সালেহকে। সে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতিত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ এসে গেছে। এটি আল্লাহর উষ্ট্রী তোমাদের জন্যে প্রমাণ। অতএব একে ছেড়ে দাও, আল্লাহর ভুমিতে চড়ে বেড়াবে। একে অসৎভাবে স্পর্শ করবে না। অন্যথায় তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে। (সূরা আরাফ-৭৩)

হযরত সালেহ (আ) তাদের তাওহীদের উপদেশ দিলেন এবং মুতিপূর্জা ত্যাগ করতে বলেন। কিন্তু তাদের উপর এর কোনই আসর (প্রভাব) হল না। বরং তাদের বিদ্বেষ ও দুশমনী আরো বৃদিধ দেন। তারা শক্তভাবে তাঁর বিরোধিতা করতে লাগলো এবং

মূর্তিপূক্ত থেকে মোটেই বিরত হলো না। যদিও একটি ক্ষুদ্র দল আল্লাহর একত্বের ঈমান আনলো। কিন্তু বড় বড় কওমের নেতারা আল্লাহর অবাধ্যই রয়ে গেল। দাম্ভিকরা ক্রোধরত স্বরে বলতঃ " তোমরা যা বিশ্বাস কর আমরা তা অস্বীকার করি' (সূরা: আরাফ, ৭৬)

হযরত সালেহ (আ.)-এর দাম্ভিক ও অহংকারী কওম তাঁর নবুওতের দাওয়াত ও নসীহত- উপদেশ অস্বীকার করলো এবং দাবি জানালো, আল্লাহর নিদর্শনের (মুজিযার) তখন সালেহ (আ.) আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানালেন এবং সে ফরিয়াদ কবুল হওয়ার পর স্বীয় কওমকে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের দাবিকৃত আল্লাহর নিদর্শন উটনীর আকারে দেয়া হলো। দেখ, যদি তোমরা ঈমান না আন এবং উটনীকে কষ্ট দাও তবে তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব আসবে। কিন্তু সামুদরা শেষ পর্যন্ত সীমালাংঘন করল । তারা উটনীর পায়ের গোছা কেটে তাকে হত্যা করল। প্রতিফল এ হলো তাদের উপর মহানাদ এর আযাব অবতীর্ণ হলো এবং তারা তাদের ঘরের মধ্যেই লাশ হয়ে পড়ে রইলো। [দ্র: সূরা আল-আরাফ, ৭৫]

তথ্যসূত্র:

https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=15&chapter=2163

স্বীয় কওমের প্রতি হযরত ইব্রাহিম (আ) এর দাওয়াত :

হযরত ইব্রাহিম (আ.) হচ্ছেন, মুসলিম উম্মাহর জাতির পিতা এবং একমাত্র সত্য ধর্ম ইসলামের একজন কালজয়ী নবী ও রাসূল। তিনি হচ্ছেন আল্লাহর বন্ধু তথা খলিলুল্লাহ। ইবরাহীম (আ) এর যুগে, তাঁর দেশে তখন নমরুদের রাজত্ব চলত। তৎকালীন সময়ে সবাই মূর্তি পূজা করত। যা কখনোই ইব্রাহিম আ. ছোট থেকেই মেনে নেননি। যখনই তাঁর জ্ঞান হয়েছে তখনই তিনি মনে করেছেন সূর্য ই বোধ হয় আমার রব কিন্তু দিনের শেষে সূর্য যখন ডুবে যায় তখনই তাঁর জ্ঞানে তিনি বুঝতে পারেন, সূর্য কখনোই তাঁর রব হতে পারে না কেননা যে সত্যিকারের রব, তাঁর মৃত্যু

নেই এভাবে তিনি ও রাতের তারা, অপরুপ সুন্দর চাঁদ ইত্যাদির যাচাই করে দেখলেন তাদের ও কোনো নিজস্ব অস্তিত্ব নেই। এরপর আল্লাহ তাঁকে তাঁর নিজস্ব সত্তার সন্ধান দিলেন। যে সত্তা চির অবিনশ্বর, চিরঞ্জীব। আর এভাবেই হযরত ইব্রাহিম আ. আল্লাহর সত্যিকারের সন্ধান পেলেন। এরপর আল্লাহ তাঁকে নবুওয়াত দান করলেন। নবুওয়াত পাওয়ার পরই তিনি তাঁর জাতিকে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর জাতি তার কথায় কোনো কর্ণপাত করলো না। বরং তারা তাঁকে মূর্তি পূজা না করার কারণে ভৎসনা দিতে লাগলো। এমনকি তাঁর পিতাও তাঁকে মূর্তি পূজা করার জন্য চাপ দিতে লাগলেন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলে গেলো যে, কোনো মতেই তিনি তাঁর জাতিকে বুঝাতে পারলেন না যে, এই মূর্তি কখনোই কারো উপকার কিংবা অপকার করতে পারে না। এমনকি তারা নিজেদের ও কোনো উপকারে লাগে না। এমতাবস্থায় কোনো এক উৎসবের দিন সবাই নিজ এলাকা ছেড়ে উৎসবের মেলায় গেলে, তিনি তাঁর জাতির উপাসনালয়ে গিয়ে কুড়াল দিয়ে সকল মূর্তি গুলো ভেঙ্গে দিলেন। যে কুড়ালটি দিয়ে সব ধ্বংস করলেন, সেই কুড়ালটি তিনি বড় মূর্তির কাঁধে রেখে দিলেন। মেলা শেষে যখন সবাই উপাসনালয়ে এসে এই অবস্থা দেখল, সবাই বলাবলি করলো, আমরা সবাই উৎসবে গেলেও ইব্রাহিম কিন্তু যায়নি। এটা তাঁর কাজ হতে পারে। সবাই গিয়ে ইব্রাহিম (আ) কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা না করে, মূর্তিদের জিজ্ঞাসা করো। ঐ যে, বড়টা কাঁধে কুড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে এই ধবংস করেছে। তাঁর কথা শুনে তাঁর জাতির লোকেরা বলল, ইব্রাহিম তুমি তো জানো, এই মূর্তিরা কথা বলতে পারে না। তখন ইব্রাহিম আ. বললেন, দেখো তোমরা এমন সব মূর্তিকে ইলাহ মনে করো, যে নিজে কোনো কথা বলতে পারে না। নিজের কোনে উপকার করতে পারে না। তাকে কেউ ধ্বংস করলে, তাকেও বাধা দিতে পারে না। তাহলে কেন মূর্তির তোমরা এই ইবাদত করো?

হযরত ইব্রাহিম (আ.) এর কথা শুনে তাঁর জাতির লোকেরা বুঝে নিল যে, এই ইব্রাহিমই তাদের মূর্তি গুলোকে ধ্বংস করেছে। এভাবেই হযরত ইব্রাহিম (আ.) তাঁর জাতিকে মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে দাওয়াত দিয়ে গেছেন।

তথ্যসূত্র:

https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=15&section=339

স্বীয় কওমের প্রতি হযরত লূত (আ.) এর দাওয়াত:

লূত (আঃ)-এর কওম আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে শিরক ও কুফরীতে লিপ্ত হয়েছিল। দুনিয়াবী উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হওয়ার কারণে তারা সীমা লঙ্ঘনকারী জাতিতে পরিণত হয়েছিল। পূর্বেকার ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলির ন্যায় তারা চূড়ান্ত বিলাস-ব্যসনে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। অন্যায়-অনাচার ও নানাবিধ দুষ্কর্ম তাদের মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এমনকি পুংমৈথুন বা সমকামিতার মত নোংরামিতে তারা লিপ্ত হয়েছিল, যা ইতিপূর্বেকার কোন জাতির মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়নি। জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে নিকৃষ্ট ও হঠকারী এই কওমের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ লূত (আঃ)-কে প্রেরণ করলেন। কুরআনে লূতকে 'তাদের ভাই' *(শো'আরা ২৬/১৬১)* বলা হ'লেও তিনি ছিলেন সেখানে মুহাজির। নবী ও উম্মতের সম্পর্কের কারণে তাঁকে 'তাদের ভাই' বলা হয়েছে। তিনি এসে পূর্বেকার নবীগণের ন্যায় প্রথমে তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে বললেন,

إِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيْعُوْنِ، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، (الشعراء ১৬২-১৬৪)-

'আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি এর জন্য তোমাদের নিকটে কোনরূপ প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্বপ্রভু আল্লাহ দিবেন' *(শো'আরা ২৬/১৬২-১৬৫)*। অতঃপর তিনি তাদের বদভ্যাসের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, أَتَأْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِيْنَ-

‘বিশ্ববাসীর মধ্যে কেন তোমরাই কেবল পুরুষদের নিকটে (কুকর্মের উদ্দেশ্যে- *আ‘রাফ ৭/৮১*) এসে থাক’? ‘আর তোমাদের স্ত্রীগণকে বর্জন কর, যাদেরকে তোমাদের জন্য তোমাদের পালনকর্তা সৃষ্টি করেছেন? নিঃসন্দেহে তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়’ *(শো‘আরা ২৬/১৬৫-১৬৬)*। জবাবে কওমের নেতারা বলল,

لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا لُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ، قَالَ إِنِّيْ لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِيْنَ- (الشعراء -১৬৭-১৬৮)-

‘হে লূত! যদি তুমি (এসব কথাবার্তা থেকে) বিরত না হও, তাহ’লে তুমি অবশ্যই বহিষ্কৃত হবে’। তিনি বললেন, ‘আমি তোমাদের এইসব কাজকে ঘৃণা করি’ *(শো‘আরা ২৬/১৬৭-১৬৮)*। তিনি তাদের তিনটি প্রধান নোংরামির কথা উল্লেখ করে বলেন,

وَلُوْطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ وَتَأْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ، قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ- (العنكبوت -২৮-৩০)-

‘তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ কখনো করেনি’। ‘তোমরা কি পুংমৈথুনে লিপ্ত আছ, রাহাজানি করছ এবং নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে গর্হিত কর্ম করছ’? জবাবে তাঁর সম্প্রদায় কেবল একথা বলল যে, আমাদের উপরে আল্লাহর গযব নিয়ে এসো, যদি তুমি সত্যবাদী হও’। তিনি তখন বললেন, ‘হে আমার পালনকর্তা! এই দুষ্কৃতিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তুমি আমাকে সাহায্য কর’ *(আনকাবূত ২৯/২৮-৩০; আ‘রাফ ৭/৮০)*।

তথ্যসূত্র:

https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=15&chapter=4298

স্বীয় কওমের প্রতি হযরত শোয়াইব (আ) এর দাওয়াতঃ

হযরত শোয়াইব (আ) প্রেরিত হয়েছিলেন মাদইয়ান শহরে। মাদইয়ান শহরের অধিবাসীরা আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর পূজায় লিপ্ত ছিল। তাই শোয়াইব (আ.) প্রথমেই তাদের তাওহিদের দাওয়াত দেন। দ্বিতীয়ত, তারা মাপজোখে হেরুফের করত এবং অন্যায়ভাবে মানুষের ধনসম্পদ ও কেড়ে নিত। তারা ব্যবসায়ী কাফেলা গুলোর সম্পদ লুট করত। সেই অধঃপতিত মাদায়েন বাসীকে সুপথে আনার জন্য শোয়াইব (আ)-কে নবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছিল। শোয়াইব (আ.) এর হাতে বহু মোজেজাও আল্লাহ তাআল প্রকাশ করেছেন। এসব মোজেজা প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদের এ কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে এক সময় তোমরা জনসংখ্যায় খুব কম ছিলে। এরপর আল্লাহ তা' আলা তোমাদের গোত্রের জনংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং প্রভাব-বিত্ত সমৃদ্ধি করেছেন। সুতরাং তোমাদের উচিত আল্লাহর প্রতি ইমান আনা ওজন সঠিকভাবে দেওয়া, ন্যায় নিষ্ঠার পথ অনুসরণ করে মানব সমাজের শান্তি ও সংহতি রক্ষা করা। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন

আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েবকে প্রেরণ করেছি। সে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণ এসে গেছে। অতএব তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ন কর এবং মানুষকে তাদের দ্রব্যদি কম দিয়ো না এবং ভুপৃষ্টের সংস্কার সাধন করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। এই হল তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। তোমরা পথে ঘাটে এ কারণে বসে থেকো না যে, আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে হুমকি দিবে, আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করবে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করবে। স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে অধিক করেছেন এবং লক্ষ্য কর কিরূপ অশুভ পরিণতি হয়েছে অনর্থকারীদের। আর যদি তোমাদের একদল ঐ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি এবং একদল বিশ্বাস স্থাপন করে যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি এবং একদল বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে ছবর কর

যে পর্যন্ত আল্লাহ আমাদের মধ্যে মীমাংসা না করে দেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী। (সূরা আরাফ ৮৫-৮৭)

তথ্যসূত্র:

https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=15&chapter=4367

হযরত মূসা (আঃ) এর দাওয়াত:

মিশরের কাফির সম্রাট ফেরাউন খ্যাত দ্বিতীয় রামিসেস সিদ্ধান্ত দিয়েছিল বনী ইসরাঈলের উপর সীমাহীন নিপীড়ন চালাতে এবং কোন পুত্র সন্তান জন্ম নিলে তাকে হত্যা করতে। কিন্তু স্রষ্টার অভিপ্রায়-সেই বনী ইসরাঈলের গৃহে জন্ম নেয়া শিশু সন্তান হযরত মূসা(আঃ) কে তিনি ফেরাউনের গৃহেই প্রতিপালন করেন। অতঃপর এই শিশু পুত্র যখন পরিপূর্ণ বয়সে পদার্পন করে তখন নিদর্শন স্বরুপ দান করলেন লাঠি সর্প হয়ে যাবার মতো বিস্ময়কর মুজিজা। এমনকি তাকে সহযোগিতা করতে তাঁরই আপন ভ্রাতা হারুন (আঃ)কেও একই দায়িত্বে মনোনয়ন করা হয়। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন,

“তুমি এবং তোমরা ভ্রাতা আমার নিদর্শনসহ ফেরাউনের নিকট যাও, কেননা সে ঐদ্ধত্য প্রকাশ করেছে আর আমার স্মরণে শৈথিল্য প্রদর্শন করো না। অতঃপর তোমরা তার সাথে নম্রতার সহিত কথা বলো হয়তো সে চিন্তা ভাবনা করবে অথবা ভীত সন্ত্রস্থ হবে।” (সূরা তোয়াহাঃ ৪২-৪৪)

হযরত মূসা ও হযরত হারুন (আঃ) ফেরাউনেরন কাছে পৌঁছে তার সামনে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করলেন। তারা বললেন আমরা উভয়েই তোমার পালন কর্তার প্রেরিত রাসূল। অতএব আমাদের সাথে বনী ইসরাঈলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে নিপীড়ন করোনা। ফেরাউন জিজ্ঞাসা করলো , তবে হে মূসা তোমার পালন কর্তা কে ? হযরত মূসা (আঃ) জবাবে বললেন , আমাদের পালন কর্তা তিনি যিনি প্রত্যেক

বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতিতে পালন করেছেন এবং পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি ভুল করেন না এবং কোন কিছু ভুলেও যান না।

এত কিছু শ্রবন করেও অভিশপ্ত ফেরাউন আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো না বরং আল্লাহ প্রদত্ত নিদর্শন অবলোকন সত্ত্বেও তাদেরকে জাদুকর বলে আখ্যায়িত করলো। ফলশ্রুতিতে অবাধ্য ফেরাউন সম্প্রদায়ের উপর নানা প্রকার বিপর্যয় নেমে এলো। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দুর্ভিক্ষ, বন্যা, পঙ্গপাল, ব্যাঙের উপদ্রব, এবং পাত্রের পানি রক্তে পরিনত হওয়া সহ বিভিন্ন দুর্যোগ দিয়ে পরীক্ষা করলেন। কিন্তু এতেও যখন কোন শুভ ফল হলোনা তখন আল্লাহ তাদেরকে নীলনদে মতান্তরে লৌহিত সাগরে ডুবিয়ে মারলেন। এই মর্মে সূরা তোয়া-হা এর ৭৮ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে,

“অতঃপর ফেরাউন তার সৈন্য বাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল এবং সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণ রুপে নিমজ্জিত করলো”।

হযরত মূসা (আঃ) এর চাচাতো ভাই কারুন অফুরন্ত ধন সম্পদের অধিকারী ছিলো। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বর্ণনা মতে , কারুনের ধন ভান্ডারের চাবি বহন করতে ষাট জন শক্তিশালী কর্মচারী লাগত। তাওরাত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে তার সিন্দুকের চাবী বহন করতে সত্তরটি উষ্ট্রের প্রয়োজন হত। কিন্তু কারুন ছিলো অহংকারী। যে আল্লাহ তাকে এতো বিপুল সম্পদের অধিকারী করেছেন সে আল্লাহর প্রতি তার মোটেও কৃতজ্ঞতা ছিলনা। বনী ইসরাঈলের সাধারণ মানুষ তখন সীমাহীন দরিদ্রতায় বিপর্যস্থ। কারুন এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সে অন্যদেরকে হেয় চোখে দেখতো। আর সম্পদকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের চাবি কাঠি মনে করতো। আল্লাহর নবী হযরত মূসা (আঃ) তাকে সম্পদের যাকাত প্রদানের আহ্বান জানালে সে অস্বীকৃতি জানায় এবং দ্বীনের শত্রুতায় মেতে উঠে। এমনকি তার সম্মানের উপরও আঘাত হানার চেষ্ঠা করে। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তাকে এবং তার সমুদয় সম্পদ ভূগর্ভে চিরদিনের জন্য বিলীন করে দেন।

তথ্যসূত্র:

http://www.manabadhikarkhabar.com/details.php?id=1616

হযরত ইসা (আঃ)-এর দাওয়াতঃ

ঈসা (আঃ) নবুয়ত লাভ করার পর স্বীয় কওমকে প্রধানতঃ নিম্নোক্ত ৭টি বিষয়ে দাওয়াত দিয়ে বলেন,

يَابَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ-

‘হে বনু ইস্রাঈলগণ! আমি তোমাদের নিকটে আগমন করেছি **(১)** আল্লাহর রাসূল হিসাবে **(২)** আমার পূর্ববর্তী তওরাত কিতাবের সত্যায়নকারী হিসাবে এবং **(৩)** আমার পরে আগমনকারী রাসূলের সুসংবাদ দানকারী হিসাবে, যার নাম হবে আহমাদ’... *(ছফ ৬১/৬)*। তিনি বললেন,

وَإِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ

‘**(৪)** নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার পালনকর্তা এবং তোমাদের পালনকর্তা। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত কর। এটাই সরল পথ’ *(মারিয়াম ১৯/৩৬)*।

তিনি বললেন,

وَمُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُواْ اللهَ وَأَطِيعُونِ- (آل عمران ٥٠)-

‘আমার আনীত এ কিতাব (ইনজীল) পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতকে সত্যায়ন করে এবং এজন্য যে, **(৫)** আমি তোমাদের জন্য হালাল করে দেব কোন কোন বস্ত, যা তোমাদের জন্য হারাম ছিল। আর **(৬)** আমি তোমাদের নিকটে এসেছি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শন সহ। অতএব **(৭)** তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর’ *(আলে ইমরান ৩/৫০)*।

এটার ব্যাখ্যা এসেছে অন্য আয়াতে যে,

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ كَثِيْرًا- وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيْماً- -(النساء ১৬০-১৬১)-

‘বস্তুতঃ ইহুদীদের পাপের কারণে আমরা তাদের উপরে হারাম করেছিলাম বহু পবিত্র বস্তু, যা তাদের জন্য হালাল ছিল। এটা ছিল **(১)** আল্লাহর পথে তাদের অধিক বাধা দানের কারণে’। ‘এবং এ কারণে যে, **(২)** তারা সূদ গ্রহণ করত। অথচ এ ব্যাপারে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, **(৩)** তারা অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করত। বস্তুতঃ আমরা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি বেদনাদায়ক শাস্তি’ *(নিসা ৪/১৬০-১৬১)*। তিনি আরও বলেন,

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُوْنَ- -(الأنعام ১৪৬)-

‘এবং ইহুদীদের জন্য আমরা **(১)** প্রত্যেক নখবিশিষ্ট পশু হারাম করেছিলাম এবং **(২)** ছাগল ও গরু থেকে এতদুভয়ের চর্বি আমরা তাদের জন্য হারাম করেছিলাম। কিন্তু ঐ চর্বি ব্যতীত যা পৃষ্ঠে কিংবা অন্ত্রে সংযুক্ত থাকে অথবা অস্থির সাথে মিলিত থাকে। তাদের অবাধ্যতার কারণে আমরা তাদের এ শাস্তি দিয়েছিলাম। আর আমরা অবশ্যই সত্যবাদী’ *(আন‘আম ৬/১৪৬)*।

তথ্যসূত্র:

https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=15&chapter=4480

বিশ্বনবীর দাওয়াত ও ইসলাম প্রচার:

মানুষের হেদায়াতে উদ্দেশ্যে যুগে যুগে মহান আল্লাহ তায়ালা অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁরা পথভ্রষ্ট মানব জাতিকে আহবান করেছেন। এ সত্যের পথে, হেদায়াতের পথে হেদায়াতের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ করেন। হযরত জিবরাঈল (আ) নবী (সা) কে নবুওয়াতে সুসংবাদ প্রদান করেন হেরা গুহায় থাকা কালীন। প্রথম অহি নাযিল হয় সূরা আলাকে ১-৫ নং আয়াত। এর কিছু দিন পরে নাযিল হয় সূরা আল-মুদ্দাচ্ছিরের প্রথম কিছু আয়াত। তখন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম শুরু করেন ইসলাম প্রচার।

দাওয়াতের ময়দানে রাসুলুল্লাহ সা. প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল সর্বোত্ত দৃষ্টান্ত। মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র জীবনের পদক্ষেপ প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি মুহূর্ত ইসলামের দাওয়াত ও প্রচার-প্রসারেই ব্যয় হয়েছে। স্বয়ং আল্লাহ তাঁকে এ আদেশ দিয়েছেন "হে রাসূল! আপনার প্রতি যা অহি আসে লোকদের কাছে পৌঁছে দিন" (সুরা: মায়েদা:৬৭)

রাসূল সাঃ এর গোপন দাওয়াতঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করলেন। কুফর শির্ক ও জাহেলিয়াত নিমজ্জিত সমাজে ব্যাপকভাবে তাওহীদের বাণী প্রচারের জন্য প্রাথমিকভাবে দরকার ছিল একটা ছোট দল, যারা ঈমানী চেতনা ও তাওহীদের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সকল যুলুম-নির্যাতন সহ্য করেও ইসলামের ওপর অটল থাকবে এবং মানুষকে দাওয়াত দিবে। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম কাছের এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দেরকে ইসলামের দাওয়াত দান করেন। তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম এর নবুওয়াতের উপর ঈমান এনে ইসলাম কবুল করেন। এতে রাসূল (সা) এর অন্তর প্রশান্ত হয় এবং তিনি দাওয়াতী কাজ

চালিয়ে যাওয়ার সাহস অর্জন করেন। নবুওতের প্রথম তিন বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম গোপনে দাওয়াতি কাজ করেন। এ সময় তাঁর উপর সালাত ফরজ করা হয়। এবং তিনি সালাত আদায় শুরু করেন। প্রথমে দু' রাকাত করে সালাত ফরজ করা হয়, পরে তা বাড়ানো হয়।

ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম সম্মানিত দলের ব্যক্তিগণ হলেন

- খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রাঃ)
- ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল (রাঃ)
- আলী ইবনে আবি ত্বালিব (রাঃ)
- আবু বকর ইবনে আবি কুহাফা (রাঃ)
- যায়েদ বিন হারিসা (রাঃ)
- সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা:)
- উসমান ইবনে আফফান (রাঃ)
- যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রাঃ)
- আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)

গোপনে ৩ বছর দাওয়াতে প্রায় ৬০ জন ইসলাম গ্রহণ করে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম এর প্রকাশ্য দাওয়াতঃ যখন ঈমানী চেতনায় দৃঢ় মুমিনদের একটি দল সৃষ্টি হল এবং তাদের রিসালাতে দাওয়াতের বোঝা বহনের মত যোগ্যতা ও ক্ষমতা অর্জিত হল তখন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম কে আদেশ দিলেন প্রকাশ্যে দাওয়াতি কাজ শুরু করার জন্য। আল্লাহ তা'আ নির্দেশ দেন এবং তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করো" [সূরা আশ শু'আরা-২১৪]

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম তাঁর আত্মীয় স্বজনদের, কুরাইশদের প্রতিটি গোত্র - উপগোত্রকে সাধারণ ও বিশেষভাবে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিছুদিন পরেই আল্লাহ সূরা আল হিজরের ৯৪ নং আয়াত নাযিল করলেন ""অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরওয়া করবেন না", (সূরা আল হিজর-৯৪)

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহর রাসূল মুশরিক সমাজের অলিগলি ঘুরে ঘুরে প্রকাশ্যের দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন। তিনি মানুষকে আল্লাহর কিতাব পড়ে শুনাতে থাকলেন এবং আল্লাহর আযাব সম্পর্কে সর্তক করতে লাগলেন। তিনি প্রকাশ্য দিবালোকে কাবার সামনে সালাত আদায় করতে শুরু করলেন। ফলে তাঁর দ্বীনের দাওয়াত দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগল, এবং একের পর এক লোকজন ইসলামে দীক্ষিত হতে থাকলো।

হজ্জের মৌসুমে মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে যখন লোকেরা আসত কাবা তাওয়াফ করতে তখন সেখানে উকাস, মাজনা ইত্যাদি উৎসব হতো, বিভিন্ন মেলা হত, আসরে বসত লোকেরা। সেখানে রাসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম ইসলামের দাওয়াত দিতেন। তিনি প্রত্যেক গোত্রের লোকদের কে আহবান করে বলতেন হে মানুষ সকল, বলো, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই তাহলে তোমরা সফলকাম হবে। (মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বল)

মক্কায় দাওয়াতি কাজে আশানুরুপ ফল না পেয়ে রাসূল (সা) তায়েকে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যান। তাদের গোত্রের নেতৃস্থানীয়দের দাওয়াত দিলে তারা প্রত্যাখ্যান করে।

বহির্বিশ্বে ইসলাম এর দাওয়াত পৌঁছে দেন রাসূলুল্লাহ তাঁর সাহাবী হযরত জাফর ইবন আবি তালিবের মাধ্যমে। হাবশায় হিজরতের ফলে ইসলামের সুমহান বাণী মক্কার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে তৎকালীন হাবশার রাজা নাজ্জাশী হযরত জাফর (রা.) এর মুখে পবিত্র কুরআনের বাণী শুনে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহী ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীদেরকে সাহায্য সহযোগিতার ঘোষণা দেন এবং দাওয়াতী কাজে সহযোগিতা করেন। হাবশায় ইসলামের আগমন ও নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ দ্রুত সিরিয়াতে ও পৌঁছে যায়। সেখানেও বহু সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করে। পরবর্তীতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম পত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের বাদশা ও সমাজ পতিগণের নিকট ইসলাম পৌঁছে দেন। হাবশার সম্রাট নাজ্জাশী, মিশরের সম্রাট মুক্কাওক্বিসের, পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ, রোমের সম্রাট কায়সার, মুনযির বিন সার্ভীর, ইয়ামামা প্রধান হাওয়া বিন আলী, দামিশক্কের গর্ভপর হারিস বিন আবী শামির গাসানীর ও. আম্মানের সম্রাটের নিকট পত্র প্রেরণ করেন।

পরিশেষে বলা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম ছিলেন এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ট দায়ী ইলাল্লাহ। তিনি তাঁর জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত ব্যয় করেছেন ইসলামী দাওয়াত প্রচার-প্রসার তথা ইসলামের সুমহান আদর্শ মানুষের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

ইসলাম প্রচারে সাহাবীগণ:

পূর্ববর্তী নবীগণের আবির্ভাব বিশেষ বিশেষ জাতির প্রতি, নির্দিষ্ট শহর, নগর বা এলাকা ও অঞ্চলে হয়েছে । তাঁদের ইন্তেকালের পর নিয়মানুযায়ী তাদের নবুওয়াত সমাপ্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম কিয়ামত পর্যন্ত আগত বিশ্বের সমস্ত মানব জাতির জন্য রসুল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। সুতরাং আরব, অনারব, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব মানুষ এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম-এর যুগে যারা বিদ্যমান ছিলেন, কিয়ামত পর্যন্ত যারা আগমন করবেন সবাই উম্মতে মুহাম্মাদির অন্তভুক্ত হবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন -

বলে দাও, হে মানব মন্ডলী। তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহ প্রেরিত রসূল, সমগ্র আসমান ও যমীনে তার রাজত্ব। একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কারো উপাসনা নয়। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা সবাই বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহর উপর তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর উপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর এবং তাঁর সমস্ত কালামের উপর। তাঁর অনুসরণ কর যাতে সরল পথপ্রাপ্ত হতে পার। (সূরা আরাফ, ১৫৮)

অন্য এক আয়াতে আল্লাহপাক ঘোষণা করেন-আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (সূরা:সাবা; ২৮)

এই আয়াত দুটোর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম সারা বিশ্বজাহানের সমস্ত মানুষের জন্য নবী ও ও রাসূল হিসেবে আগমন করেছেন। কিন্তু আরব দেশে তৎকালীন বৈরী পরিবেশে যাদের সঙ্গে নিয়ে দ্বীন ও ইসলাম প্রচার করলেন তারাই হলেন সাহাবায়ে কেরাম। নবুওয়াত লাভের পর রসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম- এর দাওয়াতে সর্বপ্রথম হযরত খাদিজা (রা.), হযরত আবু বকর (রা) হযরত আলী (রা), হযরত যায়েদ (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম ইসলাম প্রচারের জন্য স্বীয় জীবন উৎসর্গকারী সাহাবা কেরামের এমন একটি দল গঠন করলেন যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টির জন্য কাফের মুশরিকদের যে কোনো জুলুম - নির্যাতন সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। ইসলাম প্রচারে সাহাবীগণ যে কতটা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তা বুঝা যায় এভাবে যে, সাহাবীদের সংখ্যা ছিল সোয়া লক্ষের মত। কিন্তু মক্কা ও মদিনায় সাহাবীদের কবরের সংখ্যা প্রায় বিশ হাজার। বাকী লক্ষাধিক সাহাবী পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছেন। মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকার জন্য। ঘর-বাড়ী, ধন-সম্পদ ও আত্মীয়-স্বজনের মমতার বন্ধন ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন কুফুরী থেকে আনুগত্যের দিকে এবং অন্ধকার থেকে আলোর দিকে দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে। তারা মক্কা মদীনায় পড়ে থাকা অপেক্ষা মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়াকে

শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন, যে কাজের দায়িত্ব ছিল আল্লাহর প্রেরিত সব নবী-রাসুলের। মহান আল্লাহর কালাম আল কুরআনকে তাঁরা বুঝেছেন, শিখেছেন নিজেদের জীবনে আমল করেছেন এবং অন্যদের মাঝে তা প্রচার করেছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

"তোমরাই হলে সর্বোত্তম জাতি, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করে থাক ও অন্যায় কাজে বাধা দিয়ে থাক এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। (সূরা ইমরান, ১১০)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম এর সবচেয়ে প্রিয় সুন্নাত:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম এর সবচেয়ে বড় সুন্নাত ছিল দাওয়াত। বিশেষত অমুসলিম ভাই-বোনদের মাঝে দাওয়াত। তিনি একশত ভাগ অমুসলিমের মাঝে দাওয়াতী কাজ শুরু করেছেন। অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন এবং যারা মুসলমান হয়েছেন, তাদের ইসলাহ ও সংশোধন করেছেন। ঐতিহাসিক বিদায় হজ্বের ভাষণে সাহাবা(রা) জিজ্ঞাসা করলেন- হে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম, আপনার অবর্তমানে আমাদের কী কাজ? নবী করীম বললেন, আমার যা কাজ ছিল তোমাদেরও একই কাজ উত্তর শুনে সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন দেশে দাওয়াত দিতে ছড়িয়ে পড়লেন। অমুসলিমদের কাছে ইসলাম প্রচার করেছেন এবং লোকেরা দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। মোট কথা, নবীজীর সবচেয়ে বড় আশা ছিল প্রতিটি মানুষ যেন ইসলাম গ্রহণ করে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম সর্বদা আখিরাতের চিন্তা করতেন এবং উম্মতের ফিকির করতেন। তিনি উম্মতের দরদে এতো অস্থির ছিলেন যে, আল্লাহ তা' সান্তনা দিয়ে আয়াত অবতীর্ণ করলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন

"তারা ঈমান আনছে না এই দুঃখে হয়ত তুমি নিজের জীবন শেষ করে দিবে" (সূরা শু'আরা, ৩)

দাওয়াতি কাজে নবী ও সাহাবীদের কিছু পন্থাঃ

১. মর্যাদাবান ব্যক্তি মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে দাওয়াত দান।

তোমরা উভয়ে ফেরআউনের কাছে যাও সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে।অতঃপর তোমরা তাকে নম্র কথা বল, হয়তো সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে। (সূরা: ত্ব-হা-৪৩, ৪৪)

২. মন-মেজাজ লক্ষ্য করে পর্যায়ক্রমে পদক্ষেপ গ্রহণ।

৩. প্রতিবাদী পরিবেশে নয়, অনুকূল পরিবেশে দাওয়াত দান

যখন আপনি তাদেরকে দেখেন, যারা আমার আয়াত সমূহে ছিদ্রান্বেষণ করে, তখন তাদের কাছ থেকে সরে যান যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত না হয়, যদি শয়তান আপনাকে ভূলিয়ে দেয় তবে স্মরণ হওয়ার পর জালেমদের সাথে উপবেশন করবেন না। (সূরা: আন'আম-৬৮)

৪. অন্যমনস্ক ব্যক্তির কাছে দাওয়াত না দেয়া।

৫. যুক্তি প্রমাণ পেশ করার সময় ব্যক্তির যোগ্যতার দিকে খেয়াল রাখা

৬. জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে দাওয়াতের পদ্ধতি উন্নতি করা।

পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। (সূরা আলাক-৩, ৪, ৫)

৭. চিঠি-পত্রের মাধ্যমে, বই পড়ানোর মাধ্যমে, সমস্যার সমাধান দেখিয়ে, মিডিয়ার মাধ্যমে, আল্লাহর ক্ষমতা মাহাত্ম্য প্রমাণের মাধ্যমে দাওয়াত।

৮. সামাজিক কাজে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে দাওয়াত দান।

৯. মর্যাদার পরিপন্থি পদ্ধতি পরিত্যাগের মাধ্যমে দাওয়াত দান।

১০. জনগণের ভাষায় দাওয়াত দান করা।

আমি সব পয়গম্বরকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিষ্কার বোঝাতে পারে। অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, পথঃভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (সুরা: ইবরাহীম-৪)

১১. সহজভাবে দাওয়াত প্রদান।

" হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, - রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা (দ্বীনের দাওয়াত) সহজ করো, কঠিন করো না। সুসংবাদ দাও, ভীতশ্রদ্ধ করো না।" (বুখারী ও মুসলিম)

১২. উদ্দেশ্যের পরিপন্থি পদ্ধতি পরিত্যাগ করা। যেমনঃ বাড়াবাড়ি, অহেতুক তর্ক-বির্তক ইত্যাদি।

দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী ‘তাগুত’দেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংবার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন। (সূরা : বাকারা- ২৫৬)

১৩. বুদ্ধি ও উত্তম কৌশলের মাধ্যমে।

আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দ যুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে। (সূরা:নাহল-১২৫)

১৪. মন্দের মোকাবেলা ভালো দিয়ে।

সমান নয় ভাল ও মন্দ। জওয়াবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। (সূরা: হা-মীম- সাজদাহ – ৩৪)

শেষ কথা

পৃথিবীর শুরু থেকেই মানুষ এক অভিন্ন দ্বীনের অনুসারী ছিন। মানুষকে আল্লাহ তা'আলা সীরাতুল মুসতাকীমের প্রতি দাওয়াত দেয়ার জন্য প্রথম থেকেই নবী-রাসূল প্রেরণের ধারা অব্যাহত রেখেছেন। তাঁদেরকে প্রেরণ করার মূল উদ্দেশ্যই ছিল মানুষকে সকল দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা। আল্লাহ প্রদও ঐশী শিক্ষার দাওয়াত দেয়া। মানুষের যাবতীয় দ্বন্দের অবসান ঘটানো এবং অসভ্যাতার অন্ধকার থেকে তাদেরকে ঈমানের আলোয় আলোকিত করা মহান আল্লাহ বলেন-

সকল মানুষ একই জাতি সত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা’আলা পয়গম্বর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকরী হিসাবে। আর তাঁদের সাথে অবর্তীণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুতঃ কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ করেনি; কিন্তু পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর নিজেদের পারস্পরিক জেদবশতঃ তারাই করেছে, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ ঈমানদারদেরকে হেদায়েত করেছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদ লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, সরল পথ বাতলে দেন। (সুরা: বাকারা, ২১৩)

আল্লাহ তা' আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন শুধু তাঁর ইবাদতের জন্য আর নবী-রাসূলের দায়িত্ব মিশন ছিল আল্লাহর বার্তা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন

আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি। (সূরা আয-যারিয়াত-৫৬)

অন্য আয়াতে বলে বলেন-

এটা মানুষের একটি সংবাদনামা এবং যাতে এতদ্বারা ভীত হয় এবং যাতে জেনে নেয় যে, উপাস্য তিনিই-একক; এবং যাতে বুদ্ধিমানরা চিন্তা-ভাবনা করে। (সুরা: ইব্রাহিম ৫২)

উম্মতে মুহাম্মদী পুরোটাই দায়ী উম্মত। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যানের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। আর আহলে-কিতাবরা যদি ঈমান আনতো, তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হতো। তাদের মধ্যে কিছু তো রয়েছে ঈমানদার আর অধিকাংশই হলো পাপাচারী। (সূরা: ইমরান-১১০)

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ নবী ও রাসূল। তাঁর পরে কোন নবী ও রাসুল আসবেন না। তাঁর পূর্বে যত নবী-রাসুল এসেছিলেন প্রত্যেকেই তাদের যুগে, নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। যেমন ইব্রাহিম আ. নবী হিসেবে প্রেরিত হন, তাঁর পরে তাঁর ছেলে ইসহাক (আ.), তাঁরপর তাঁর ছেলে ইয়াকুব (আ.), তারপরে তাঁর ছেলে ইউসূফ (আ.) নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম এর পরে কোনো নবী আসবে না। কিন্তু এই দ্বীন টিকে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। তাই এই দ্বীন এর নবায়নের জন্য, দ্বীনের পূর্ণ জাগরণের জন্য এমন কিছু লোক থাকবে যারা নবীর হয়ে কাজ করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম বলেন- আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিস। অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম এর উম্মতের মাঝে থাকবেন কিছু আলেম উলামা। তাঁরা মানুষকে আহবান করবেন - সত্যের পথে, হকের পথ। ইসলামের প্রচার-প্রসারে তাঁরা কাজ করবেন নববী নীতি আদর্শ অনুসরণ করে।

নবী-রাসূল (সা) পাঠানোর আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর দ্বীন অর্থাৎ ইসলাম প্রচার করা, প্রসার ঘটানো অর্থাৎ ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে সমাজে, দেশে বা পৃথিবীতে বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

"তিনি সেই আল্লাহ যিনি তাঁর রাসুলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহকারে পাঠিয়েছেন, যেন তাকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করতে পারেন।" (সূরা তাওবা-৩৩, সূরা ফাৎহ-২৮, সূরা: ছফ-৮)

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা খুব সুন্দর ভাবে নবী-রাসূলদের মিশনের কাজের কথা বর্ণনা করেন-

আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও কাজের কথা শিক্ষা দেন। বস্তুতঃ তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট। (সূরা: আলে- ইমরান :১৬৪)

সমাপ্ত

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111378502/